মহর্ষি

ভুবন-মোহন

শ্রীপ্রমদাকিশোর সরকার

মহর্ষি ভুবন মোহন। ১

শ্রীপ্রমদাকিশোর সরকার

প্রণীত।

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ

এক টাকা আট আনা।

বাঁধাই পৌণে দুই টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রেমদাকিশোর সরকার।
গ্রাম ও পোঃ অঃ—নটা কোলা
ঢাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীভূতনাথ সরকার
"ভিক্টোরিয়া প্রেস"
২১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমারাধ্যতম

৺রামকিশোর সরকার পিতৃদেব

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

পিতঃ!

এই হতভাগ্য পুত্রের প্রবন্ধাদি দেখিয়া আপনি অনেক সময় প্রীতি লাভ করিয়াছেন; তাই আজ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আপনার পুণ্যনামে উৎসর্গ করিলাম, আশা করি স্নেহগুণে অকৃতী পুত্রের এই অকিঞ্চিৎকর উপহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদে অনুপ্রাণিত করিয়া চরিতার্থ করিবেন। ইতি ১৮ই শ্রাবণ ১৩৩০ সাল।

নটাকোলা ঢাকা } সেবক
প্রমদাকিশোর সরকার।

মুখবন্ধ

ধর্ম্মপ্রাণ, আদর্শ ভক্ত ও দীনার্ত্তের বন্ধু দিনাজপুরের স্বর্গীয় ৺মহর্ষি ভুবন মোহন করের নাম অনেকেই অবগত আছেন। আজ তিনবৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার আদর্শ জীবন সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই! দিনাজপুরের স্বনামধন্য মহাত্মা কর্ণেল পিটার তাঁহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৩২২ সালের ভাদ্র মাসে মালদহের "গম্ভীরা" নামক দ্বৈমাসিক পত্রেও একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দিনাজপুর পত্রিকায়ও কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোনটিতেই তাঁহার পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহার জীবন পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে বহুমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারি; পাপ-পঙ্কিল সংসারে থাকিয়া, কিরূপে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা শিখিতে পারি; কিরূপে মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা জানিতে পারি,—সেই আদর্শ চরিত্র, লোক সমাজে অপ্রকাশিত থাকা কাহারই বাঞ্ছনীয় নহে। তাই কতিপয় বন্ধুর আগ্রহে, মহর্ষির পুণ্যময় জীবন-চরিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম; নিজের অযোগ্যতা বুঝিয়াও নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।

এই জীবন-চরিত সংগ্রহ করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। মহর্ষি তাঁহার জীবন-চরিত প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি কাহারও নিকট তাঁহার অতীত জীবনের ঘটনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন নাই। দিনাজপুর জিলা-স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোমোহন

পাল মহাশয় তাঁহার বাসায় দীর্ঘকাল ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট কখনও কখনও দুই একটি কথা জানিয়া একখানা খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। মহর্ষি কখন কখনও ডাইরী লিখিতেন, কিন্তু তাহাও ধারাবাহিকরূপে লিখেন নাই। যাহাহউক উল্লিখিত মনোমোহন বাবুর নোট ও মহর্ষির ডাইরী হইতে অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। মহর্ষির সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র কর মহাশয়ও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রদান করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই পাপপঙ্কিল হস্তে মহর্ষির পবিত্র জীবন-চরিত অঙ্কনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ প্রীতি লাভ করিলেই সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমি সুদূর মফঃস্বলে নানাস্থানে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রুফ দেখিয়াছি, প্রেসের অধ্যক্ষ ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, এজন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়নের অভাবে পুস্তকের নানাস্থানে ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। বারান্তরে উহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা থাকিল; আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে সমুদয় ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, দিনাজপুরের উজ্জ্বল রত্ন শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বি, এল বিদ্যারত্ন, শ্রীমান্ ধরণী ধর কুণ্ডু বি এল এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ গুহ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

বিনয়াবনত

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

"ত্যক্ত্বাত্ম সুখভোগেচ্ছাঃ সর্ব্বসত্ত্ব সুখৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবো নিত্যদুঃখিতাঃ॥" ১ ॥
এতল্লক্ষণ সংযুক্তঃ সজ্জনোঽতীব দুর্ল্ভঃ।
একন্ত লেভিরে ভাগ্যা দ্দিনাজপুর বাসিনঃ॥ ২ ॥
মাতা রাসমণিস্তস্য পিতাচ পদ্মলোচনঃ।
শাক্তা জন্মধরিত্রীচ ঢাকা মণ্ডল বার্ত্তিণী॥ ৩ ॥
গুণৈরিব বভূবায়ং নাম্না ভুবনমোহনঃ।
দয়ারত্নো গুণগ্রামৈ র্বিদ্যারত্নঃ শ্রুতেনচ॥ ৪ ॥

কায়েন বাচা মনসা সুনির্ম্মলো
জ্ঞানেন ভক্ত্যাচ মনোহরদ্যুতিঃ।
সদা পরেব্রহ্মণি সুপ্রতিষ্ঠিতো
মহর্ষিকল্পশ্চ বভৌ সুপণ্ডিতঃ॥ ৫ ॥
গীতাভাগবত প্রিয়োঽতি মুদিতঃ
শ্রীরামলীলামৃতে
সর্ব্বোষাং প্রিয়দর্শনো মধুরয়া
বাচা জনাহ্লাদকৃৎ।
ধৃত্যুৎসাহ যুতঃ পরোপকৃতয়ে
জীবে পরপ্রেমিকঃ
সর্ব্বত্রৈব নতিং বিধায় বিনয়ে
দৃষ্টান্ত ভূতো মহান্॥ ৬ ॥

সমপথাখ্য বিধান চিকিৎসয়া
প্রতিদিনং শতরোগিণ আব সঃ।
চিরকুমারতয়া নিরপত্যকো
হ্যুত দরিদ্র পিতা সতু ধর্ম্মতঃ॥ ৭॥

স বাহুবেদাদ্রি শশাঙ্কমানে
শাকে সমুদ্রেন্দুম সিংহভানৌ।
হিত্বা জরাজীর্ণবপুঃ কৃতার্থং
স্বপুণ্য কর্ম্মোচিত লোকমাপ॥ ৮॥

লোকান্তরগতে তস্মিন্ হীনঃ সজ্জন সম্পদা।
অস্মাকং দুর্গতো দেশো গতো ভূয়োঽপিদীনতাম্॥ ৯

বয়ন্তু তদ্দর্শন পুণ্য ভাজো
ভূয়শ্চ তৎসংস্মৃতি পুণ্যকামাঃ।
তদাশিষা বীতমলাঃ সমেতা
স্তৎপ্রীতয়ে বিশ্বপতিং নমামঃ॥ ১০॥

তস্যাত্যুদার চরিতস্য সুগীত কীর্ত্তে
র্ভক্ত্যা তনোতি চরিতং প্রমদাকিশোরঃ।
তস্মিন্ প্রসীদতু সদা জগদন্তরাত্মা
তৎপাঠকা বিগত পাপমলা ভবন্তু॥ ১১॥

সবিনয়নিবেদমিদং

শ্রীবরদাকান্তরায় বি এল্
বিদ্যারত্নস্য।



স্বর্গীয় ৺মহর্ষি ভুবন মোহন কর।

মহর্ষি ভুবন মোহন

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস বিশ্রুত ঢাকা নগরীর ছয় মাইল দক্ষিণে শাক্তা নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামখানি আম্র, পনস, সুপারী, খর্জ্জুর, কদলি ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষে সুশোভিত। গ্রামের বাহিরে নানা শস্যরাজি সমন্বিত প্রান্তর। বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গ্রামে পদ্মলোচন কর নামে একজন বঙ্গজ কায়স্থ ভদ্রলোক বাস করিতেন। কর মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তিনি সেখানে লগ্নী কারবার করিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া কখনও কুসীদজীবিগণের নীচতা অবলম্বন করেন নাই। দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত,—তিনি তাহাদের অনেক সুদ পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া কত দরিদ্র কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছে,—কত দরিদ্র পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছে,—কত লোক কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার পর তিনি গ্রামের দীন দুঃখী-দিগকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

তিনি ধনবান হইলেও অমায়িক ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে গ্রামের আপামর সাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাসমণি দেবীও পরমা সাধ্বী, দয়াবতী ও গুণবতী ছিলেন। প্রতিবেশিগণের মধ্যে কাহারও কোন পীড়া হইলে তিনি

তাহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন, কাহারও কোন অভাব হইলে তিনি তাহার অভাব মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এজন্য পাড়ার সকলেই তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

কর মহাশয়ের তিনটি পুত্র ও চারিটী কন্যা। তাঁহার লক্ষ্মীরূপিণী পত্নী তাহাদিগকে লালন পালন করিতেন,—কর মহাশয়ের বিশাল সংসারের সমস্ত গৃহকার্য্য ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা তিনিই করিতেন, এতদ্ব্যতীত অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা, বার মাসে তের পার্ব্বণ ও ব্রতাদি ছিল। এ সকল করিয়াও তিনি প্রতিবেশিগণের সেবা করিতে ত্রুটী করেন নাই। বঙ্গীয় ১২৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হইল। এইবার তাঁহার অষ্টম গর্ভ। কয়েক মাস পরে আবার যখন গর্ভের লক্ষণগুলি প্রকটিত হইয়া উঠিল, তখন গ্রামে কতরূপ সমালোচনাই হইতে লাগিল। আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এবার কন্যা জন্মিবে, কারণ কর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র জয়চন্দ্রের জন্মের পর দুইটি কন্যা জন্মে। তারপর তৃতীয় পুত্র আনন্দ চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। আনন্দ চন্দ্রের জন্মের পর মাত্র একটী কন্যা জন্মিয়াছে, সুতরাং এ গর্ভে কন্যা ব্যতীত পুত্র জন্মিতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলিলেন, প্রথম পুত্র ঈশান চন্দ্রের পর এক কন্যা জন্মিয়াছে তার পরেই ত জয় চন্দ্র! সুতরাং এবার কন্যা কিছুতেই হইবে না—পুত্রই হইবে। এই লইয়া পাড়ায় সময় সময় বাগ বিতণ্ডা চলিত, অনেক সময় বাজি ধরা পর্য্যন্তও হইত। রাসমণি দেবীর সম্পর্কিত ভ্রাতা বা ভ্রাতৃবধূ কেহ পুত্র হইবে বলিলে বিরুদ্ধ পক্ষের বালিকাগণ ঠাট্টা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া বলিত, "তবে এবার তোমরা সাবধান—" পরশ্রীকাতর পুরুষগণ

পরোক্ষে বলিত "এবার কর মহাশয়ের পুত্র জন্মিলেই ভাল হয়. তাহা হইলে যদি তাহা দ্বারা যদুবংশ ধ্বংশ হয়!" এইরূপ গ্রামে নানাপ্রকার সমালোচনা চলিতে লাগিল। কর মহাশয়ের বৈঠকখানায় অনেক সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বলিলেন "এই গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রমে মাসের পর মাস চলিয়া গেল; মধুর মলয়ানিল-সেবিত চৈত্র মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। বন উপবন নানা ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা উৎপাদন করিল। আম্র পল্লবের শীতল ছায়ায় বসিয়া মধুর কণ্ঠ কোকিল সৃষ্টি কর্ত্তার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। রাত্রিতে নির্ম্মলাকাশ নক্ষত্ররাজিসমন্বিত চন্দ্রের উদয়ে অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতে লাগিল। মৃদু মন্দ বায়ু নব কিশলয়গুলিকে সঞ্চালিত করিয়া শরীর সুশীতল করিতে লাগিল; সেই অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াই যেন পাপিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ভগবানের গুন গান করিতে লাগিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পদ্মলোচন কর মহাশয়ের বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বন লাগা ছিল। এবার এই চৈত্র মাসের ১৲ই তারিখ বৃহস্পতিবার দোলযাত্রা। দোলে কর মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতি বৎসরেই খুব ধুম ধাম হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও

আয়োজন উদ্যোগ হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ কর মহাশয়ের বাটীতে আসিতে লাগিলেন। এই আত্মীয় সমাগমে কর মহাশয় ও তাঁহার পত্নী সুখী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মুখে এক চিন্তার মলিন ছায়া প্রকটিত হইল। রাসমণি দেবী এখন দশ মাসের গর্ভবতী, তাই তাঁহাদের ভয় পাছে দোলের পূর্ব্বে সন্তান হইয়া অশৌচে দোলের বিঘ্ন ঘটায়।

যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে ১২৩২ সালের ১১ই চৈত্রের প্রাতঃসূর্য্য নবোদ্গত অশ্বত্থ পত্রে সুবর্ণ ঢালিয়া হাসিতে হাসিতে উদিত হইলেন। কর মহাশয়ের গৃহে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। যথাকালে দোল আরম্ভ হইল,বাদ্য ভাণ্ড ও লোকজনের কোলাহলে সমগ্র গ্রামখানি মুখরিত হইল। বালক বালিকা ও রমণীগণ নানা বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া দোল দেখিতে ছুটিল। আবির কুঙ্কুমে বাড়ী ঘর রাস্তা ঘাট সমুদায় লাল হইয়া গেল। কর মহাশয়ের উচ্চ দোল বেদিকা একটী আবিরের স্তূপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অতঃপর নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণের আহারের ব্যবস্থা হইল। এই লোকের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। কর মহাশয় করযোড়ে প্রত্যেকের পাতের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অন্দরে রাসমণি দেবী সেই পূর্ণ গর্ভাবস্থায়ও অকাতরে অভ্যাগতা ও নিমন্ত্রিতাদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল, সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। বসন্তের পূর্ণ চন্দ্র হাসিতে হাসিতে পূর্ব্ব দিক উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইলেন; শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতি হাসিতে লাগিল,—নারিকেল পত্রে

ও সরসীর জলে অনির্ব্বচনীয় স্বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ হইল। মধুর মলয় হিল্লোলে জগৎ শীতল হইল। দোল যাত্রা সেদিন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল দেখিয়া করদম্পতী বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং ভগবানের অনুগ্রহেই এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে বলিয়া ভক্তি গদগদ চিত্তে সর্ব্বাঙ্গে মদনমোহনকে প্রণাম করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর মধুর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

পূর্ণগর্ভা রাসমণি দেবী সারাদিন পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন, আহার করিতে বসিলেন কিন্তু খাইতে পারিলেন না,—তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি ধাত্রী ডাকান হইল। কর মহাশয়, প্রসব বেদনার কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন মনে বাহির বাটীতে বন্ধুগণ সহ সঙ্কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন; সহসা অন্দর হইতে সাতটি হুলুধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; সঙ্গে সঙ্গে একজন পরিচারিকা গিয়া আনন্দ সহকারে তাঁহাকে তাঁহার একটি সুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া সংবাদ জানাইল। বন্ধুগণসহ করমহাশয় সে সংবাদে পরম আনন্দিত হইলেন। সেখানে যে সকল বৈষ্ণব সাধু উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আজ বড় ভাল দিন, এইদিনেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। আপনার পুত্র নিশ্চয়ই একজন সাধু হইবেন।"

পরদিন প্রাতে কর মহাশয়, ধাত্রী প্রভৃতিকে পারিতোষিক দিয়া, গ্রহাচার্য্যকে ডাকাইলেন। আচার্য্য মহাশয়, কর মহাশয়ের পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আনন্দে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর মহাশয় তাঁহাকে নবজাত শিশুর কোষ্ঠী প্রস্তুতের ভার দিলেন। আচার্য্য মহাশয় অতি আনন্দ সহকারে সে ভার গ্রহণে সম্মত হইয়া বলিলেন,

"মোটামুটি আমি যাহা দেখিতেছি তাহাতে শ্রীমান একজন আদর্শ পুরুষ হইবেন। ইনি চৈত্র মাসে জন্মিয়াছেন সুতরাং বিনয়ী, ভোগী, সুখী, সৎ-কর্ম্মান্বিত ও দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ হইবেন তারপর ইহার জন্ম ও নক্ষত্র ভালই দেখা যাইতেছে সূতিকা-ষষ্টীর পর ইহার একখানা কোষ্ঠী আমি যথাসাধ্য পরিস্কার করিয়া লিখিব। আপাততঃ আমি ইহাঁর একখানা ঠিকুজি লিখিয়া দিতেছি, তাহা দেখিয়াই পরে কোষ্ঠী প্রস্তুত করা যাইবে।" অতঃপর গ্রহাচার্য্য মহাশয় একটী ঠিকুজি লিখিয়া কর মহাশয়কে রাখিতে দিলেন। কর মহাশয় তাঁহাকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিলেন।

সাধু হউন, মহাপুরুষ হউন, কেহই দৈবের হাত হইতে এড়াইতে পারেন না। বালকের জন্মের তিন দিন পর দৈবাৎ এক প্রতিবেশীর গৃহে আগুণ লাগিল। চৈত্র মাসের দুই প্রহর বেলা, পবন প্রবল বেগে সূর্য্য রশ্মির অগ্নিকণা ছড়াইতেছিল। গৃহে আগুণ জ্বলিয়া উঠিবামাত্র পবন দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্নি ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সৃষ্টি ধ্বংশের জন্যই যেন বদ্ধপরিকর হইল। দেখিতে দেখিতে সে আগুন কর মহাশয়ের গৃহে আসিয়া লাগিল, বহু চেষ্টায়ও সে আগুন কেহ নিবাইতে পারিল না। রাসমণি দেবী অনন্যোপায়া হইয়া নবজাত শিশুকে লইয়া জঙ্গলে গিয়া নিজের ও শিশুর প্রাণ রক্ষা করিলেন। কর মহাশয়ের মূল্যবান্ গৃহ, জিনিষ পত্র, বস্ত্রালঙ্কার এবং দলিল পত্র ইত্যাদি মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত করিয়া অনল দেব নির্ব্বাপিত হইলেন, এই সঙ্গে ঠিকুজিখানাও ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাসমণি দেবীকে একটী বৃক্ষ মূলে কুটীর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল, তাহাতেই তিনি সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিলেন। এই ঘটনার জন্য দৈব দায়ী হইলেও

নব জাত শিশুর পারিবারিক লোক ও প্রতিবেশিগণের নিকট তিনি ঘর পোড়া নামে অভিহিত হইলেন। অতঃপর যথাকালে অন্নপ্রাশন হইল, তখন তাঁহার নাম রাখা হইল ভুবন মোহন।

অগ্নিকাণ্ডে কর মহাশয়ের বিস্তর ক্ষতি হইলেও কর মহাশয়কে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হয় নাই,—জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশান চন্দ্র মুক্তাগাছার রাজ সরকারে একটী উচ্চ পদ লাভ করায় অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার অভাব দূরীভূত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

ভূবন মোহন সবে চতুর্থ বৎসরে অতিক্রম করিয়াছেন। বালক শ্যামবর্ণ, সুঠাম কান্তি, মুখখানি লাবণ্যময়, চক্ষু দুটী আয়ত, উজ্জ্বল ও করুণাব্যঞ্জক। তাঁহার মুখখানি দেখিলেই তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই, অপরিচিত কেহও যদি বালককে দেখিত সেও তাঁহাকে সোহাগ না করিয়া থাকিতে পারিত না। তারপর বালকের কণ্ঠস্বর অতি মধুর। একে "অমৃতং বালভাষিতং" তারপর আবার মধুর কণ্ঠস্বর, সুতরাং মধুরে মধুর মিশিয়া স্বর্গীয় অমৃততুল্য হইত। যে একবার তাঁহার কথা শুনিত, সে আর ভুলিতে পারিত না, আবার শুনিতে চাহিত। এ জন্য কর মহাশয়ের বাড়ীতে কেহ আসিলে সে বালকের সঙ্গে আলাপ না করিয়া,—বালকের কথামৃত পান না করিয়া যাইত না। বালক অনেককে নাচিয়া নাচিয়া হরির গানও শুনাইতেন। কর দম্পতীও তাঁহাদের অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা

ভুবন মোহনের অধিকতর পক্ষপাতী হইলেন। তাঁহার জন্মের পর গৃহ-দাহ হইয়াছে বলিয়া কোন প্রসঙ্গ উঠিলে কর মহাশয় বলিতেন গৃহ দাহের আগুণ যেরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল, ভুবনও সেইরূপ এই বংশ সমুজ্জ্বল করিবে, উত্তরকালে পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইয়াছিল।

বালক ভূবন মোহন, শ্রীমান্ ও মধুর ভাষী হইলেও অতিশয় চঞ্চল ছিলেন। ঘাটে গিয়া স্ত্রীলোকগণ স্বামী শাশুড়ী ননদীর নিন্দা করিতেছে ভূবন মোহন তাহাদিগকে ঢিল মারিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিতেন। কেহ কোন মিথ্যা কথা বলিলে, তিনি তাহাকে ঢিল মারিয়া পলাইতেন। তারপর পাড়ার বালক বালিকারাও তাহাকে অনেক সময় অস্থির করিয়া তুলিত। তাঁহার জন্মের পর গৃহ দাহের প্রসঙ্গ লইয়া তাহারা—তাঁহাকে অনেক সময়ই "ঘর পাড়া ছাই খা কেচো হয়ে উড়ে যা" বলিয়া ক্ষেপাইত। ভুবন মোহন এই ছড়া শুনিলে ক্ষেপিয়া উহাদিগকে মারিতে যাইতেন। শরীরেও বেশ বল ছিল, সম্মুখে কাহাকে পাইলে তাহাকে ভালরূপ উত্তম মধ্যম দিতেন সমবয়স্কগণের কেহই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। এজন্য তাহারা এ কথা দূর হইতে বলিয়াই পলায়ন করিত, ভুবন মোহন তাহাদিগকে ধরিতে না পারিয়া মায়ের কাছে আসিয়া নালিশ করিতেন। শান্তিময়ী মাতা সাদরে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন, "তুমি ক্ষেপ, তাই ওরা ক্ষেপায়, না ক্ষেপিলে ওরা আর ওকথা বলিবে না। তোমার জন্মের পর বাড়ী পুড়িয়াছিল এটাত সত্য কথা, সত্য কথায় কি ক্ষেপিতে আছে? আমি যদি খোঁড়া হই তবে লোকে আমাকে খোঁড়া বলিবে না কেন?" মায়ের কথায় বালক শান্ত হইতেন।

ভূবন মোহন পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। একদিন প্রতিবেশী বালকগণকে ঘুড়ি উড়াইতে দেখিয়া তাঁহারও সখ হইল। তিনি গোপনে ঘুড়ি প্রস্তত করিয়া গোশালায় রাখিলেন, কিন্তু পিতা সর্ব্বদা বাড়ী থাকেন, সুতরাং তাঁহার আর ঘুড়ি উড়াইবার সুযোগ ঘটিল না। ঘুড়িখানি সেই খানেই নষ্ট হইয়া গেল।

সেই সময়ই তাঁহার লেখা পড়া শিক্ষার ঝোঁক বেশ ছিল, পাঠ-শালায় ছেলেরা যে সকল পাতা লিখিয়া ফেলিয়া দিত, ভুবন মোহন তাহা কুড়াইয়া আনিয়া—তাহার উপর দিয়া হাত ঘুরাইতেন, এবং "ক", "খ" ইত্যাদি পড়িতেন। তাহার ফলে তাঁহার হাতে খড়ি দেওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার অনেকটা অক্ষর পরিচয় হইয়া গেল। অতঃপর যথাকালে কর মহাশয় তাঁহার হাতে খড়ি দিয়া তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

পাঠশালায় যাইতে ভুবন মোহনের স্ফুর্ত্তি দেখে কে? তিনি প্রত্যহ সকলের আগে পাঠশালায় যাইতেন,—একদিনও অনুপস্থিত থাকিতেন না। গুরুমহাশয় যাহা শিখাইতেন তাহা অতি আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন। এজন্য গুরুমহাশয়ও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি পাঠশালা হইতে বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বদাই পাঠ অভ্যাস করিতেন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রতিবেশী বালকদিগের সহিত ব্যায়ামজনক খেলা খেলিতেন। কিন্তু কেহ মিথ্যা কথা বলিলে কি প্রবঞ্চনা করিলে আর তাহার রক্ষা ছিল না। বলশালী বালক অমনি তাহাকে আক্রমণ করিত, এজন্য ভয়ে কেহ তাঁহার সমক্ষে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব্যবহার করিত না।

একদিন প্রাতে একটী প্রতিবেশী বালক তাঁহার নামে মিথ্যা কথা বলায় ভুবন মোহন তাহাকে প্রহার করিলেন, সে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া কর মহাশয়কে জানাইল। কর মহাশয় পুত্রকে যথেষ্ট শাসন করিলেন। বিচারে মিথ্যাবাদীরই জয় হইল দেখিয়া ভুবন মোহন ক্রোধে ও অভিমানে সারাদিন কিছুই খাইলেন না। লুকাইয়া লুকাইয়া থাকিতে লাগিলেন। মাতা কত করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। সন্ধ্যার সময় আর থাকিতে পারিলেন না। ক্ষুধায় অধীর হইয়া উঠিলেন, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইল, তখন ধীরে ধীরে মায়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন, মনে করিলেন এখন মা একবার খাইতে বলিলেই খাইবেন। ফলেও তাহাই হইল বালকের মলিন মুখ দেখিয়া স্নেহময়ীর হৃদয় বিগলিত হইতেছিল, কিন্তু তিনি ধরা না দেওয়ায় এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে খাওয়াইতে পারেন নাই। এক্ষণে নিকটে পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া সস্নেহ মধুর বচনে খাইতে বলিলেন। বালক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভোজনে বসিলেন। বালক ভুবন মোহন এই দিন হইতে বুঝিলেন রাগ ও অভিমান খারাপ জিনিষ; উহাতে নিজেরই কষ্ট হয়। সেই হইতে তিনি ক্রোধ ও অভিমান পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই সময় হইতে আর তাঁহাকে ক্রোধাভিমানের বশবর্ত্তী হইতে দেখা যায় নাই।

হরি সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাড়ার কোন স্থানে হরি সঙ্কীর্ত্তন হইলে তিনি তথায় না যাইয়া ছাড়িতেন না। মনোযোগ ও অধ্যবসায়ে ভুবন মোহন পাঠশালার ছাত্রগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল, বালক ভুবন মোহন

নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং মাসিক দুই টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বালক ভুবন মোহন ত নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইলেন, এখন তিনি কোথায় পড়িবেন ইহাই এক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কারণ গ্রামে আর উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যালয় নাই। এখন যেমন উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় যেখানে সেখানে হইয়াছে, তখন তেমন ছিল না। আট বৎসরের ছেলেকে ঢাকায় পরের কাছেই বা কেমন করিয়া রাখা যাইতে পারে? তাহাকে স্থানান্তরে রাখিয়া মাতা রাসমণি দেবীই বা কিরূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? মাতা যে তাঁহাকে না দেখিলে, দশদিক্ অন্ধকার দেখেন,—ভুবন সঙ্গে না খাইলে যে তাঁহার খাওয়া হয় না। আবার মায়ের সঙ্গে না খাইলে যে ভুবনেরও পেট ভরে না। তিনি হাজার খাইলেও মায়ের সঙ্গে একবার খাইতে বসেন।

শাক্তার অনুমান ৫ মাইল দূরে একটী মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল। শাক্তা হইতে ঢাকা যতদূর, মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়টী তদপেক্ষা কিছু নিকটবর্ত্তী এবং কোন নদীও পার হইতে হয় না, আর ঢাকার পথে সুপ্রসিদ্ধা বুড়ী-গঙ্গা পার হইতে হয়। কিন্তু গ্রামের কোন বালক এই মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়ে না। তথায় পড়িতে হইলে এই অষ্টম বর্ষীয় বালককে একাকী সেই জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম্য পথে এতদূর প্রত্যহ

যাতায়াত করিতে হইবে। এই দুধের বালক এত হাঁটিতেই বা পারিবে কেন? কত দম্পতী ও অন্যান্য সকলে এইরূপ নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অষ্টম বর্ষীয় বালক ভুবন মোহনের তখন বিদ্যা শিক্ষার জন্য অদম্য উৎসাহ জন্মিয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "আপনারা অনর্থক ভয় করিতেছেন কেন? এই রাস্তাটুকু আর আমি যাইতে পারিব না? ইহার অধিক দূরে গেলেও আমার কষ্ট হইবে না। আমি অনায়াসে এই পথটুকু যাইতে পারিব। দিনের বেলায় যাইব, পথে বিস্তর লোক যাতায়াত করে, তখন আর ভয় কি? তবে বাড়ী হইতে একটু সকালে বাহির হইতে হইবে। নতুবা স্কুলে পৌছিতে বিলম্ব হইতে পারে।" বালকের কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। অতঃপর কর মহাশয় তাঁহাকে সেই বিদ্যালয়েই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ভুবন মোহন নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলেন।

তিনি বেলা নয়টার মধ্যে বাড়ী হইতে রওনা হইতেন। অত সকালে সকলের পাক হইত না। মাতা প্রাতে উঠিয়া ভুবন মোহনের জন্য পাক করিয়া দিতেন। শীতের দিনে বাসী তরকারীও বরং থাকিত। ভুবন তাহা খাইয়াই সারাদিনের মত বিদ্যালয়ে রওনা হইতেন। এই দীর্ঘ পথে যাতায়াতে তিনি কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেন না। সন্ধ্যাকালে হাসিতে হাসিতে মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তখন আবার কোথাও হরি সঙ্কীর্ত্তনের খবর পাইলে তথায় ছুটিতেন। কিম্বা মাতা তখন পুকুরে জল আনিতে যাইতেছেন, দেখিলে ভুবন মোহন তাঁহার সঙ্গে গিয়া জলের কলসী নিজে মাথায়

করিয়া আনিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত মায়ের গৃহকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বাড়ীর সকলের খাওয়ার পর মাতা খাইতে বসিলে, তখন ভুবন মোহন মাতার সহিত খাইতেন। আহারান্তে পড়িতে বসিতেন, পড়া ভালরূপ শিক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি শয়ন করিতেন না। তা রাত্রি থাক আর প্রভাত হউক, তাহাতে লক্ষ্য করিতেন না। কোন কঠিন বিষয় সহজে মুখস্থ করিতে না পারিলে, তিনি তাহা শ্লেটে বা কাগজে লিখিতে থাকিতেন, তাহাতে সহজে মুখস্থ হইত। কোন বিষয়টী একবার না বুঝিলে,বারংবার চেষ্টা করিতেন এবং যে পর্য্যন্ত তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম না হইত, সে পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ্ করিতেন না। যে যে স্থান একেবারে বুঝিতে পারিতেন না,কিম্বা যে যে স্থানে তাঁহার সন্দেহ থাকিত, স্কুলে গিয়া শিক্ষক মহাশয়ের নিকট তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতেন এবং খাতায় লিখিয়া রাখিতেন ও তিনি এইরূপ লিখিয়া মক্স করিয়া হাতের লেখাও অতি সুন্দর করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায়, মনোযোগ, সৌজন্য, বিনয়, পাঠ-নৈপুণ্য এবং সচ্চরিত্রতায় তিনি অচিরেই শিক্ষক ও ছাত্রগণের অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি শ্রেণীর প্রথম ছাত্র হইলেও কখনও তিনি ঐ স্থানে গিয়া বসেন নাই। তাঁহাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ছাত্রদিগকে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মান্য করিতেন। তিনি তাহাদিগকে উপরের দিক বসিতে দিয়া নিজে তাহাদের নীচে গিয়া বসিতেন। ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কোন বিষয় তাঁহার নিকট বুঝিতে আসিলে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া অতীব বিনীতভাবে বলিতেন "আমি আপনাদিগকে বুঝাইতে পারি এমন্ ক্ষমতা আমার নাই, তবে আপনারা দয়া

করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন আমি যাহা বুঝিতে পারিতেছি তাহাই বলিতেছি।” তিনি যাহাকে যাহা বুঝাইতেন, তাহা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। শিক্ষক মহাশয়েরও বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত। এজন্য অনেক ছাত্রই তাঁহার নিকট সাহিত্য ও গণিত বুঝিয়া লইত।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল; নিদারুণ বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাটের যে দুরবস্থা ঘটে তাহা বর্ণনাতীত। স্কুলে যাওয়ার পথের কতকাংশ কর্দ্দমাকীর্ণ হইল। কতক বা পিচ্ছিল হইয়া গেল, আর কোন কোন স্থান বা বন্যায় প্লাবিত হইয়া স্রোতস্বিনীর অভিনয় করিতে লাগিল। ভুবন মোহন একখানা গামছা পরিয়া কাপড় চোপড় ও বইগুলির একটা পুটলী করিয়া সেই দুর্গম পথে ছাতা লইয়া কতদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া আছাড় খাইয়া স্কুলে গিয়াছেন, কতদিন তাঁহার সম্মুখে বজ্রপাত হইয়াছে, তিনি তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইল। ভুবন মোহন উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজন সে সংবাদে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। ভুবন মোহনের উৎসাহ ও উদ্যম চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার জ্ঞান পিপাসাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। বালক ভুবন মোহনের কঠোর সাধনা ফলবতী হইল, চারিদিকে ভুবন মোহনের প্রশংসা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে ভুবন মোহনকে কি পড়ান হইবে ইহা লইয়া পিতা ও ভ্রাতৃগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে ঢাকায় রাখিয়া ইংরাজী পড়ান স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি যে সত্ত্ব শুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানের আলোক চাহেন তাহা কোথায়? তাঁহার আত্মা যাহা চায়, তাহা যে ইংরাজী ভাষায় নাই। তিনি শুনিয়াছিলেন ইংরাজী ভাষা কেবল জড় জগৎ লইয়াই ব্যস্ত—জগৎ-কারণ চিদানন্দ পুরুষ ইংরাজী শিক্ষার বিষয়ীভূত নহেন। তিনি জানিতেন একমাত্র ভগবানই জীবের জ্ঞেয়। যে শিক্ষায় তাঁহাকে জানা যায় না, তাহা শিক্ষাই নহে। তারপর তিনি মাতৃভাষায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজী, বিজাতীয় ভাষা। যাহা হউক পিতা তাঁহাকে, তাহা পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—অতএব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি জানিতেন,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

পূজার অবকাশের পর স্কুল খুলিলেই ঢাকায় গিয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইবেন ইহাই স্থিরীকৃত করিয়া ঈশান চন্দ্র বিদায়ান্তে পুনরায় মুক্তা-গাছা চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জগৎ নশ্বর বা পরিবর্ত্তনশীল। আজ তুমি পুত্র কন্যা লইয়া সুখের সাগরে ভাসিতেছ, কাল হয়ত তুমি তাহাদিগকে হারাইয়া দুঃখের

অতলে ডুবিবে। আজ তুমি রাজা, কাল হয়ত ফকির! আজ তুমি ধনী—কতলোক তোমার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেছে, কাল হয়ত তুমি অন্নের কাঙ্গাল হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিবে। ইহাই জগতের নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেহই ঘটাইতে পারে নাই বা পারিবে না। আর্থিক অবস্থাও যদি মানুষের আয়ত্তাধীন থাকিত তবে অর্থনীতি বিশারদ মিতব্যয়ীগণ অবশ্যই ধনকুবের হইয়া চিরসুখী হইতে পারিতেন। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন, "নারিকেলের জলের ন্যায় লক্ষ্মীর আগমন কেহ দেখিতে পায় না; আবার হস্তী ভক্ষিত কয়েথবেলের ন্যায় তাহার প্রস্থানও কেহ দেখিতে পায় না।" সাধারণতঃ লোকে ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া থাকেন।

পদ্মলোচন কর মহাশয় তাঁহার গৃহদাহের ক্ষতি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। পারিবারিক লোক বৃদ্ধির সঙ্গে খরচও বাড়িয়াছে,—তাঁহার নিজ ব্যবসায়ে তাহা নির্ব্বাহিত হওয়া কষ্টকর হইলেও তাঁহার কোন কষ্ট নাই। উপযুক্ত পুত্র ঈশান চন্দ্র বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন, সুতরাং তাঁহার সংসার পূর্ব্বাপেক্ষা বরং স্বচ্ছল ভাবেই চলিতেছে, তিনি মনে করিতেছেন, পুত্র আনন্দ চন্দ্রকে এক্ষণে ওকালতি পাশ করাইয়া কোন স্থানে বসাইতে পারিলে তাঁহার অবস্থা আরও উন্নত হইবে। তারপর ভুবনমোহনকে ইংরাজী পড়াইতে দেওয়া যাইতেছে, সে যেরূপ ছেলে তাহাতে সে নিশ্চয়ই ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী হইয়া একজন বড়দরের হাকিম হইতে পারিবে। তাহা হইলেই ত তাঁহার বংশ উজ্জ্বল হইবে। তিনি এইরূপ কতই সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ভাগ্য লক্ষ্মী চঞ্চলা

হইয়া উঠিল। ঈশান চন্দ্র মুক্তাগাছায় ফিরিয়া যাইবার কয়েক দিন পরেই কঠিন জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইয়া নৌকা পথে বাড়ী রওনা হইলেন। মুক্তাগাছা হইতে শাক্তা প্রায় চারি দিনের পথ। পথিমধ্যে নৌকায় কোন সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল না। অধিকন্তু ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া উত্তরোত্তর বাড়ীতে লাগিল। নৌকাখানি খরস্রোতা শীতলাক্ষীর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে একডালার নিকট পৌছিলে, ঈশান চন্দ্রের জীবন-স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। মাল্লাগণ শব লইয়া শোকার্ত্ত-হৃদয়ে কর মহাশয়ের ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগাইল। কর মহাশয় পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের পীড়ার সংবাদ জানিতে পারেন নাই, অকস্মাৎ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। বিলাপের করুণ ধ্বনিতে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রতিবেশিগণ সান্ত্বনা করিতে গিয়াও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক প্রতিবেশিগণের চেষ্টায় শব-সৎকার হইল। কর মহাশয়ের আশা ভরসা সুখ শান্তি সেই চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল। শ্মশানের চিতা নিবিলেও কর মহাশয়ের হৃদয় চিতা নিবিল না, সে চিতা দিবানিশি জ্বলিতে লাগিল, ঈশান চন্দ্রের যুবতী ভার্য্যা তাহার ইন্ধন হইলেন। কর মহাশয় যখনই সেই হতভাগিনীর বৈধব্য-মূর্ত্তি দর্শন করিতেন তখনই তাঁহার সেই শোকানল দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিত। সে বেগ আর তিনি অধিক দিন সহ্য করিতে পারিলেন না; নিদারুণ শোক সন্তাপে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং বৎসরান্ত না হইতেই তিনি পরিবারবর্গকে শোক ও দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া শোকতাপময় মর-জগৎ পরিত্যাগ করতঃ শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে কর মহাশয়ের পুত্রগণ মধ্যে কেহই সংসারাভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পরই দলে দলে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহার পুত্রদিগকে শ্রাদ্ধের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইঁহারা কেহ পুরোহিত, কেহ তন্ত্রধার, কেহ বৈদিক সুতরাং এই সময়ই ইঁহাদের উপদেশ বিতরণের প্রকৃত সময়। নচেৎ পাছে ঠকিতে হয়! কেহ বলিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র রূপার দান সাগর করুন, স্ত্রী ও অপরাপর পুত্রগণ ষোড়শ করুন। কেহ বলিলেন, দানের কাপড় ও জিনিষপত্র যেন ভাল হয়, তাঁহারা কর মহাশয়ের ন্যায় একজন ধনবানের শ্রাদ্ধে সামান্য খেলো জিনিষের আশা করেন না। কেহ বা তাঁহার দূর সম্পর্কিত একজন অশ্রুতনামা পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করার জন্য অনুরোধ করিলেন। এইরূপ দিন দিনই উপদেশের স্রোত বাড়িতে লাগিল। জয়চন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র দেখিলেন পিতা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ একেবারে যেন তেন প্রকারে করিলে সম্মান থাকে না। তখন তাঁহারা যথাসাধ্য সচ্ছল ভাবেই শ্রাদ্ধ করা স্থির করিলেন, যথাকালে সুশৃঙ্খল ভাবে শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহিত হইল। এই শ্রাদ্ধে কর মহাশয়ের সঞ্চিত অর্থ সমুদায়ই ব্যয় হইয়া গেল। ঘরে আর এক কপর্দ্দকও থাকিল না। জয়চন্দ্র মনে করিয়াছিলেন আপাততঃ অরক্ষণীয় শ্রাদ্ধের ব্যয় সঞ্চিত অর্থে নির্ব্বাহ করিয়া সম্ভ্রম বজায় রাখিবেন, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। তখন লগ্নী প্রায় দুই হাজার টাকা ছিল। তাঁহার এ আশাও ছিল যে ঐ টাকা উঠাইয়া অতঃপর সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।

কর মহাশয়ের শ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। জয়চন্দ্র খাতক-

গণের নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেহ দেনার ভয়ে সম্পত্তি বেনামী করিল, কেহ দেউলিয়া সাজিল, কেহ বা টাকা নেয় নাই বলিয়া সাফ জবাব দিল। এই সময় তাঁহার মাতা, বিধবা ভ্রাতৃবধূ, তিনটি ভ্রাতা, তুইটি ভগিনী তাহার পোষ্য ছিলেন। পরিবার মধ্যে কেহ উপার্জ্জন-কারী নাই। জয় চন্দ্রের নিজেরও বাড়ী ছাড়িবার উপায় নাই। আনন্দ চন্দ্রের তখন কোন স্থানে কোন চাকুরীর সুবিধা হয় নাই। ভুবন মোহন ও যাদব চন্দ্র তখন বালক। সুতরাং তখন তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলাই তুষ্কর হইয়া উঠিল। কিছুদিন জিনিষ পত্র বন্ধক ও বিক্রয় করিয়া চালাইলেন, ক্রমে তাহাও প্রায় অচল হইয়া উঠিল। তখন আনন্দ চন্দ্র পেটের দায়ে ওকালতির আশা বিসর্জ্জন দিয়া ঢাকা জজ কোর্টের একজন নকলনবিশ হইয়া অতি কষ্টে পরিবারের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। মনে করিয়াছিলেন নিজে উকিল হইবেন, ভুবন মোহনকেও ইংরাজী পড়াইয়া হাকিম করিবেন, কিন্তু দারিদ্র্যের প্রবল স্রোতে তাঁহার সেই উচ্চ আশা ভাসিয়া গেল। তিনি ভুবন মোহনকে ইংরাজী পড়ানোর সঙ্কল্প একবারে পরিত্যাগ করিলেন। পরম ভগবদ্ভক্ত ভুবন মোহন ইহা ভগবানের করুণা মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন।

শাক্তা গ্রামে ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একটি টোল ছিল। সে টোলে কলাপ, ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। ভুবন মোহনের অনেক দিন হইতে আধ্যাত্ম বিদ্যার আকর সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হইয়া ছিল।

এক্ষণে তিনি এই টোলে সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন কলাপ, ব্যাকরণ তিন বৎসরের কমে শেষ করা যায় না। তাই তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ পড়িবার প্রস্তাব করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কখনও মুগ্ধবোধ পড়েন নাই, সুতরাং তাহা পড়াইতে সম্মত হইলেন না। তখন ভুবন মোহন সবিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়া আছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুগ্ধবোধের সূত্রগুলি বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিলেই আমি বুঝিয়া লইতে পারিব।" ভুবন মোহনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। অতঃপর ভুবন মোহন প্রত্যহ টোলে গিয়া মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কুটুম্ব বাড়ী বা কোন স্থানে নিমন্ত্রণে গেলে, টোলের ছাত্রগণ কত কাণ্ডই করিত, কেহ গাইত, কেহ বাজাইত, কেহ কেহবা তাস দাবা পাশা খেলিত, কিন্তু ভুবন মোহন কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। তিনি এক কোনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে আপন পাঠাভ্যাস করিতেন, এইরূপে দুই বৎসরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেষ করিয়া রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও ভট্টিকাব্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসর কাল কাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন কিন্তু অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিতেন, তিনি এ পর্য্যন্ত অনেক ছাত্র পড়াইয়াছেন কিন্তু ভুবনের মত ছাত্র তিনি আর পান নাই। অমন বিনয়ী, সচ্চরিত্র, মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র আর দেখেন নাই। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছেন তেমন আনন্দ আর তাঁহার অধ্যাপক জীবনে পান নাই। শেষ বৎসর

তিনি অনেক সময় ভুবন মোহনকে অধ্যাপনার ভার দিয়া পরীক্ষা করিতেন এবং ভুবন মোহনের ব্যাখ্যা শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতেন।

ভুবনমোহন বাড়ীতে থাকিয়া টোলে পড়িতেছেন, আর দারিদ্র্যের নিদারুণ পীড়া অনুভব করিতেছেন। তাঁহার যে মাতা ও ভ্রাতৃবধূ একদিন মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা ছিলেন আজ তাঁহাদের পরিধানে শতগ্রন্থিযুক্ত ঘেঁটে মার্কিণের মলিন বস্ত্র। যাঁহাদের পাতে একদিন কত উপাদেয় সামগ্রী পড়িয়া থাকিত,—আর দাস দাসীগণ সেই পরিত্যক্ত সামগ্রী পাইবার জন্য লালায়িত হইত, এক্ষণে তাঁহাদের একবেলা এক মুষ্টি শাকান্ন পর্য্যন্তও অনেক দিন জুটিয়া উঠে না। যে ভ্রাতাভগিনী প্রত্যহ কত বড় বড় মাছ, দধি দুগ্ধ ও মিঠাই খাইত, কত নূতন নূতন মূল্যবান্ বেশভূষা পরিধান করিত, আজ তাঁহারা সময়মত দুটি অন্ন পান না। তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্তও নাই; যে বাড়ী একদিন অধমর্ণ ও আত্মস্বজনের কোলাহলে মুখরিত হইত, আজ সেখানে দারিদ্র্যের হা হুতাশ! প্রত্যহ বহু লোক যাহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে আসিত, আজ তাহারাই আবার ঋণের জন্য পরদ্বারে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিতেছে। আনন্দ চন্দ্র সামান্য যাহা কিছু পাইতেন তদ্দ্বারা নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বাড়ীতে অতি সামান্যই দিতে পারিতেন। তাহা তপ্ত কটাহে জলবিন্দুবৎ অল্প সময় মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই সকল দেখিয়া পারিবারিক দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য ভুবন মোহন খড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে সংস্কৃত জানা বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাশ ছাত্রভর্ত্তি হইলে মাসিক পাঁচ

টাকা বৃত্তি পাইতে পারে। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে এক আশার সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন নর্ম্ম্যাল স্কুলে পড়িলে যদি বৃত্তি পাওয়া যায় তবে তিনি বাড়ীতে খাইয়া প্রত্যহ স্কুলে পড়িবেন, তাহাতে বাড়ীরও একটু সাহায্য হইবে, এবং পরিণামে পাশ করিতে পারিলে একটা স্কুলে শিক্ষকতাও মিলিবে। এই মনে করিয়া ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পরামর্শ করতঃ নর্ম্ম্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হওয়াই স্থির করিলেন। অতঃপর সবিনয়ে অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতৃপদধূলি মস্তকে লইয়া ভুবনমোহন ঢাকা রওনা হইলেন।

তখন সুপ্রসিদ্ধ নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ঢাকা নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত, এবং মিঃ সিঃ এরাটুন স্কুলের অধ্যক্ষ। ভুবন মোহন প্রথমে হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন।

পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে ও ব্যাকরণে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তখন তিনি অধ্যক্ষ সাহেবকে বলিয়া ভুবন মোহনের মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। ভুবন মোহন বৃত্তির আদেশ পাইলেন। বিনা ব্যয়ে স্কুলে পড়িবার অনুমতি পাইয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবের আদেশে তাঁহার বাড়ীর সাহায্যের অন্তরায় ঘটিল। সাহেব আদেশ দিলেন, ভুবন মোহনকে স্কুলের বিধানানুসারে ছাত্রাশ্রমে থাকিতে হইবে। তখন তিনি বড় বিপদে পড়িয়া বিপদ্ভঞ্জন ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে পুনরায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট যাইয়া বিনয় করুণ বাক্যে সাংসারিক অবস্থা ও আন্তরিক ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় একজন সদাশয়

পুরুষ ছিলেন। ভুবন মোহনের দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি ভুবনমোহনকে আশ্বাস দিয়া অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট গেলেন। সাহেব তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তাঁহাকে ভুবনমোহনের অবস্থা জানাইয়া তাঁহার ছাত্রাবাসে থাকার আদেশ রহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যক্ষ সাহেব ভুবনমোহনের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। ভুবন-মোহন ছাত্রাবাসে থাকার দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অতঃপর ভুবনমোহন প্রত্যহ বাড়ী হইতে গিয়া নর্ম্ম্যাল স্কুলে বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। দূরের স্কুল, তাহাতে আবার খেয়া পার হইতে হয়; এজন্য ভুবনমোহন প্রাতে উঠিয়া স্কুলে যাওয়ার যোগাড় করিতেন। মাতা সিদ্ধপোড়া কিছু পাক করিয়া দিতেন, তিনি তাহা খাইয়াই স্কুলে রওনা হইতেন। কখনও কখনও বা চাউল অভাবে সে সিদ্ধ পোড়াও জুটিত না, চিড়ামুড়ি খাইয়া স্কুলে যাইতেন। বৃত্তির টাকা পাইলেই মাতৃচরণে অর্পণ করিতেন, তাহা হইতে খেয়া ঘাটের পাটনীকে দিয়া যাহা থাকিত মাতা তাহা সংসারে খরচ করিতেন। তাহাতেও সাংসারিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ঘটিবেই বা কিরূপে? নদী শুকাইলে তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় না। কর-পরিবার দারিদ্র্যের কঠোর পেষণে নিষ্পেষিত

হইতেছে, কিন্তু এখনও তাঁহাদের বাড়ী হইতে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ ও ব্রতাদি একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তাঁহারা দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইলেও তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই, এখনও তাঁহারা আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই, এখনও তাঁহারা সাধ্য থাকিতে ফকির বৈষ্ণবকে বিমুখ করেন না। এখনও অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় তাঁহারা বিমুখ হয়েন না। সুতরাং এই সামান্য আয়ে তাঁহাদের অভাব মোচন হইবে কেন? আনন্দচন্দ্র ও ভুবনমোহনের কয়েকটী টাকায় মাসে কয়েক দিন মাত্র চলিত, তারপর আবার যে অনাটন সেই অনাটন। অনেক সময় ধার কর্জ্জও মিলিত না। অভাবগ্রস্থকে কেহ সহজে ধারও দিতে চাহে না। একদিন ঘরে চাউল চিড়া বা মুড়ি কিছু ছিল না ভুবন-মোহন না খাইয়া স্কুলে গেলেন। মাতা প্রতিবেশিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও সারাদিনে কাহারও বাটীতে একসের চাউলও ধার পাইলেন না। তখন আষাঢ় মাস। আমও ফুরাইয়াছে, সুতরাং খাওয়ার কোন যোগাড় হইল না। সন্ধ্যার সময় ভুবনমোহন অনাহারক্লিষ্ট শরীরে বাটীতে ফিরিয়া মাতা-ভ্রাতাভগিনী প্রভৃতির অনাহার-শুষ্ক-বদন দর্শন করিয়া ব্যথিত হইলেন, এবং মনে মনে অগতির গতি দীনবন্ধু ভগবানের নিকট তাঁহাদের দুঃখ মোচনের জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিলেন। কি আশ্চর্য্য! সে প্রার্থনা যেন তৎক্ষণাৎ দয়াময়ের পাদপদ্মে গিয়া পৌছিল। সন্ধ্যার পর ভুবনমোহন ঘরে গিয়া পড়িতে বসিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহার নাকে সুপক্ক কাঁঠালের ঘ্রাণ আসিল, তখন তিনি জননীকে উহা জানাইলেন। জননী কহিলেন,

"ঘরেত পাকা কাঁঠাল নাই, তবে যদি বাগানে থাকে তাহা বলিতে পারি না।" এই কথা শুনিয়া তিনি আলো লইয়া বাগানে গিয়া একটি গাছে পাকা কাঁঠাল পাইলেন। তখন ভুবনমোহনের আনন্দ দেখে কে? তিনি কাঁঠাল লইয়া মাতাকে আসিয়া বলিলেন, দেখুন মা ভগবানের কি দয়া! তিনি আজ আমাদিগকে অনাহার ক্লিষ্ট দেখিয়া বায়ু যোগে পাকা কাঁঠালের সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন। আমরা বুঝি না, তাই এমন দয়ময়কে ভুলিয়া থাকি।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল ও কণ্ঠস্বরে জড়তা আসিল। অতঃপর জননী কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া সকলকে দিলেন। ভুবনমোহনের অনুরোধে জননীও খাইলেন; তারপর ভুবনমোহনও খাইয়া সে দিনের ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত করিলেন। ক্রমান্বয় সাতদিবস মধ্যে আর কোন টাকা পয়সা পাইলেন না, কিন্তু বাগানে প্রত্যহই কাঁঠাল পাকিতে লাগিল। সেই কাঁঠাল খাইয়াই সপ্তাহকাল জীবনধারণ করিলেন। এইত গেল আহারের কষ্ট, পরিধেয়ের কষ্টও বর্ণনাতীত। ভুবনমোহনের মাত্র দুইখানা পরিধেয় বস্ত্র তাহাও জীর্ণ ও মলিন, চাদরখানিও তদনুরূপ। তিনি সেই ধুতি চাদর লইয়াই নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্র ও ঝড় সহ্য করিয়া এবং বর্ষার জল ও কাদা পায়ে ঠেলিয়া শীলা বৃষ্টি ও বজ্রপাতে দৃকপাৎ না করিয়া প্রত্যহ যথানিয়মে স্কুলে যাইতে থাকিলেন। এ সকল কষ্টের উপর তাঁহার আর এক কষ্ট, তিনি অর্থাভাবে সমুদয় পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারিলেন না। স্কুলের পর সমপাঠিগণের কাহারও পুস্তক হইতে নকল করিয়া আনিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই পুস্তক নকল করার জন্য তাঁহার অনেক দিন বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত।

কতদিন তিনি কত ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। এস্থলে আমরা তাহার একটা কথা উল্লেখ করিতেছি।

একদিন ছুটির পর পুস্তক নকল করিয়া সন্ধ্যার সময় ঢাকা নগরীর পার্শ্ববর্ত্তিনী বুড়ীগঙ্গা পার হইলেন, সে দিন অমাবস্যা, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল, দুই চক্ষে কিছু দেখা যায় না। ভুবনমোহন সেই অন্ধকারে একাকী দ্রুতপাদবিক্ষেপে বাড়ী পানে ছুটিয়াছেন। যখন তিনি জনমানবশূন্য একটি সুবিস্তৃত শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সহসা একটা বিকট হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ভুবন-মোহন চমকিয়া কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইলেন, আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। তখন তিনি মনে মনে মঙ্গলময়ের নাম স্মরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। আবার সেই বিকট হাস্যধ্বনি শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনন্তে মিশিয়া গেল। ভুবনমোহন এবার "কে ও?" "কে ও" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। এবার তাহার হৃদয়েও কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মনে করিলেন, এই নির্জ্জন শ্মশানে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে এই দুর্য্যোগের মধ্যে কি কোন মানব এখানে আসিতে পারে? আর যদি আমার মত কোন হতভাগ্য আসিয়াও পড়ে, তবে এরূপ বিকটহাসি হাসিবে কেন? এ নিশ্চয়ই শ্মশানবিহারী প্রেত। আবার মনে করিলেন, কৈ অনেক শিক্ষিত লোকই ত প্রেতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা ত বলেন উহা দুর্ব্বল হৃদয়ের কল্পনাপ্রসূত প্রহেলিকা মাত্র। এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমনই আবার পদ সঞ্চালন করিয়াছেন অমনি

আবার সেই বিকট হাস্যধ্বনি তাঁহার নিকটেই উত্থিত হইল। এবার হাসিতে তিনি বুঝিলেন এটি মানুষের হাসি। তখন তিনি যেদিকে হাসি শুনিয়াছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। সহসা বিদ্যুৎ চমকিল, এবং সেই আলোকে অদূরে একটা নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তখন ভুবনমোহন বুঝিলেন এই নারীই সেই বিকট হাস্যকারিণী। তখন তাঁহার হৃদয়ে আবার সাহস আসিল। তিনি তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কে তুমি? বল নচেৎ এখনই তোমার মাথা গুড়া করিব।" নারী মূর্ত্তি উত্তর করিল, "আমি।" ভুবনমোহন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কিন্তু তাহার আর উত্তর পাইলেন না। মূর্ত্তি আবার "হি হি" করিয়া উচ্চ হাসি হাসিল। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকিল,—ভুবনমোহন সেই আলোকে দেখিলেন তাহার পরিচিত এক পাগলিনী কতকগুলি হাঁড়িপাতিল লইয়া বসিয়া কখনও উচ্চ হাসি হাসিতেছে, কখনও বা বির বির করিতেছে। তখন তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে তথা হইতে রওনা হইলেন। এদিকে পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া জননী রাসমণি দেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া উঠিয়াছেন। একে অমাবস্যার অন্ধকার, তাহাতে আবার মেঘাড়ম্বর! তারপর আবার রাস্তায় নানা ভয়ের কথা শুনা যায়! তাই তিনি ব্যাকুলা হইলেন। প্রতি নিমেষে তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে পরিবারস্থ সকলেই নিতান্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; এমন সময় ভুবনমোহন আসিয়া মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সহাস্য বদনে রাস্তার সেই ভীষণ কাণ্ড বর্ণনা করিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক, হইলেন এবং ভুবনমোহনের অসীম সাহসিকতার প্রশংসা করিলেন। জননীর মনে

সন্দেহ হইল, ভুবনমোহন নিশ্চয়ই ভয় পাইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে জলপড়া ইত্যাদি খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভুবনমোহন বলিলেন, "মা! আমি ভয় পাই নাই। পাগলীকে দেখিয়া ভয় পাইব কেন মা? শ্মশানে মশানে, সাগরে পর্ব্বতে, অন্তরে ও বাহিরে ভবভয়হারী ভগবান যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন। তিনি থাকিতে ভয় কি? তিনি যে বরাভয়দাতা। তাঁহার উপর যাহার বিশ্বাস নাই সেই দুর্ব্বল-হৃদয়ই ভয়ে অভিভূত হয়। মা! আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি কিছুমাত্র ভয় পাই নাই। আপনি আর জলপড়ার চেষ্টা করিবেন না।" পুত্রের কথায় জননী সন্তুষ্ট হইলেন, ভুবনমোহনকে আর জলপড়া খাইতে হইল না।

তিনি আরও একদিন এক সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। একদিন পড়িতে পড়িতে রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে। জগৎ নিস্তব্ধ। হঠাৎ বাহিরে হাসির শব্দের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিলেন, কিন্তু আর কিছু শুনিতে না পাইয়া তিনি বাতি নিবাইয়া শয়ন করিলেন। শুইবামাত্র আবার সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন পুনরায় কাণ পাতিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এবার বুঝিলেন এ কোন মানুষের হাসির শব্দ নহে, নিকটবর্ত্তী কলা গাছের ঝোপ হইতে ঐ শব্দ উত্থিত হইতেছে। তখন তিনি একাকী ধীরে ধীরে তথায় গিয়া দেখিলেন একটি শুষ্ক কদলি পত্রের সহিত মৃদু মন্দ সমীর সঞ্চালনে অপর একটি শুষ্ক পত্রের সংঘর্ষণ হওয়ায় এরূপ শব্দ হইতেছে। তিনি ভীতিব্যঞ্জক কোন কিছু দেখিলে বা শুনিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির

করিতেন। তিনি বলিতেন, অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই কারণ পাওয়া যায়। কারণ পাওয়া গেলে আর ভয় থাকে না।

এইরূপ ক্লেশ ও বিপদের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ভুবন মোহন অতুল অধ্যবসায় সহকারে পড়িতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যে তাঁহার চরিত্রে ও পাঠনৈপুণ্যে শিক্ষকগণ তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতে লাগিলেন, সমপাঠিগণও তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

সপ্তম অধ্যায়

সুখ ও দুঃখ জগতে রথচক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে, কেহই জগতে চির-দুঃখী বা সুখী থাকিতে পারে না। রাত্রির পর দিন অবশ্যই হয়। জ্যোতিষিগণ,গ্রহ-সঞ্চারই এই পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কর পরিবার গ্রহবৈগুণ্যে, দুঃখ অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন। সহসা যেন উষার শুভ্র জ্যোতিঃ সে অন্ধকার নাশ করিতে উদ্যত হইল। কর পরিবারের অদৃষ্ট আকাশের ঘোর ঘনঘটা বিদূরিত হইবার লক্ষণ লক্ষিত হইল, আনন্দচন্দ্র ফরিদপুরে ডিক্রিজারীর মহুরী নিযুক্ত হইলেন। আনন্দচন্দ্রের চাকরিতে অর্থাভাব অনেকটা ঘুচিল কিন্তু কর-পরিবার গ্রামের পরশ্রীকাতরগণের চক্ষুঃ শূল হইয়া পড়িলেন। তাহারা দেখিল আনন্দচন্দ্রের পিতা এক সময়ে গ্রামে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারাই প্রভুত্ব পাইয়াছিল, এখন আবার যদি ইহাদের অবস্থা ভাল হয় তবে আবার তাহাদের প্রভুত্বের লাঘব হইবে। তারপর জয়চন্দ্র অনেক দুর্দ্ধর্ষ খাতকের নিকট ন্যায্য প্রাপ্য তাগাদা করিতে

যাওয়ায় তাহাদের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে যে সকল খাতকের টাকা আদায়ের জন্য এতদিন আদালত অবলম্বন করিতে পারেন নাই, তাহারা এক্ষণে আনন্দচন্দ্রের চাকুরী হওয়ার সংবাদে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ইহারা সকলেই এক্ষণে কর পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল, জয়চন্দ্র তখন ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" এই নীতির অনুসরণ করিলেন। তিনি বিক্রমপুরের অন্তঃর্গত পাউলদিয়া গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলেন।

পাউলদিয়া, ঢাকা হইতে প্রায় বার মাইল দূরে। সুতরাং এতদূর হইতে প্রত্যহ স্কুলে যাতায়াত ভুবন মোহনের পক্ষে অসম্ভব হইল। তখন জ্যেষ্ঠদ্বয় তাঁহাকে স্কুল বোর্ডিঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করিলেন। এক্ষণে তাঁহার সকল অভাব দুরীকৃত হইল। তিনি পড়িবার সময় পাইলেন, শিক্ষকগণের সাহচর্য্য লাভের সুবিধা ঘটিল, আবশ্যক পুস্তকগুলিও কিনিতে পারিলেন। তিনি অতুল উদ্যমে ও অসীম উৎসাহে দিবা-রাত্রি পাঠাভ্যাসে নিরত থাকিতেন। সন্ধ্যার সময় দলে দলে ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ বেড়াইতে বাহির হইত; কত সময় বোর্ডিঙ্গে তাস দাবা পাশার শ্রাদ্ধ হইত, কিন্তু ভুবন মোহন কোন দলেই মিশিতেন না। প্রধান শিক্ষক বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার অতুল অধ্যবসায়, অপরিসীম উদ্যম, পাঠনৈপুণ, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতার জন্য তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তিনি সকল বিষয়েই স্কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন। শনিবার স্কুলের পর অনেক ছাত্র বাড়ী যাইত, কিন্তু পড়ার ক্ষতি হইবে মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দিনের অবকাশ ভিন্ন তিনি বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিলেন।

বৈশাখ মাসে একদিন জননীর এক পত্র পাইয়া দেখিলেন মাতা তাঁহাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছেন। ভুবন মোহন পরবর্ত্তী শনিবার স্কুল ছুটির পর বাড়ী গিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবেন বলিয়া উত্তর দিলেন। অতঃপর শনিবার স্কুল ছুটির পর বোর্ডিঙ্গে আসিয়া বাড়ী রওনা হইলেন। ঢাকা নগরীর পার্শ্ববর্ত্তিনী বুড়ী গঙ্গা পার হইয়া কিছুদূর গেলে শিংধর নামে একটী নদ পাওয়া যায়। ভুবন মোহন সেই নদের কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা বেশী নাই। এই সময় আকাশের পশ্চিম কোণে একটুকু মেঘও দেখা দিল। শিংধর নদ অতিক্রম করিয়া একটি চর পাওয়া যায়। তারপর ধলেশ্বরী নদী। ধলেশ্বরী পার না হইলে আর মানুষের আশ্রয় পাওয়ার উপায় নাই। মেঘের লক্ষণ দেখিয়া নাবিকেরা নিজ নিজ নৌকা নিরাপদ স্থানে লইয়া চলিল। ভুবন মোহনের সঙ্গে যাহাদের আলাপ হইল তাহারা তাঁহাকে আরও অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। সত্যনিষ্ঠ মাতৃভক্ত ভুবন মোহন তাঁহাদের কথা শুনিলেন না। তাহা হইলে যে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে ; জননী যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছেন তিনি না গেলে জননী যে মনে বড় ব্যথা পাইবেন। প্রাণ থাকিতে যে তিনি জননীর মনে ব্যথা দিতে পারিবেন না। তাই তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করতঃ শিংধর নদ পার হইলেন এবং দ্রুত পাদবিক্ষেপে চর অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একে বালুকাময় চর, তাহাতে স্থানে স্থানে নল খাগরের জঙ্গল। ভুবন মোহন আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এদিকে সেই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দেখিতে দেখিতে বৃহদাকার ধারণ করিয়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে আকাশ

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জ্জন ক্রমেই অধিকতর ভয়প্রদ হইয়া উঠিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিকাশে জগৎ সন্ত্রাসিত হইতে লাগিল। ভুবন মোহন একাকী ভগবানের পাদপদ্মে নির্ভর করিয়া মাতৃচরণ দর্শনে ছুটিয়াছেন, তিনি আর কোন দিক দৃক্‌পাত করিতেছেন না। অনতিকাল মধ্যেই তিনি ধলেশ্বরী তীরে পৌছিয়া দেখিলেন খেয়া নৌকা নাই, অন্য কোন নৌকাও পাইলেন না। তখন কিরূপে পার হইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় প্রবল বেগে ঝড় বহিয়া বালুকারাশি উড়াইয়া ভুবন মোহনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে চরে বাড়ী ঘর বৃক্ষাদি কিছুই ছিল না, সুতরাং ভুবন মোহন আশ্রয় লইবার কোন উপায় দেখিলেন না। দেখিতে দেখিতে প্রবল বেগে বৃষ্টি ও মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতে লাগিল। ভুবন মোহন কেবল নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে থাকিলেন ও ছাতা দ্বারা অতিকষ্টে বারিধারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একটি ঘুর্ণিবায়ু আসিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া কিছুদূরে ধলেশ্বরীর বেলাভূমিতে নিক্ষেপ করিল। সেই সময় তাঁহার হাত হইতে ছাতাটিও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ছুটিয়া ধলেশ্বরীর গর্ভে নিমজ্জিত হইল। ঐ স্থানে পাড় সাত আট হাত উচ্চ, খাড়া ভাঙ্গনি, সুতরাং সহজে তীরে উঠিবার উপায় নাই। ভুবন মোহন সেই উচ্চ পাড়ের কোলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে উন্মত। উপরে ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, নীচে ধলেশ্বরীর কৃষ্ণবর্ণ জলরাশি ভীষণ গর্জ্জনে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে। ভুবন মোহনের মাথায় সেই বৃষ্টির মুষলধারা পড়িতেছে আর নিম্নদেশ

অবিরাম ধলেশ্বরীর তরঙ্গাভিঘাতে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তাহার উপর আবার প্রবল ঝটিকায় তাঁহাকে আরও অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে, ভুবন মোহন ক্রমে অর্দ্ধমৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; ঝড় বৃষ্টির বেগও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। ভুবন মোহন এতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া একাগ্রমনে ভগবান্‌কে ডাকিতে ছিলেন। এক্ষণে চক্ষু মেলিলেন এবং পাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই অবসন্ন শরীরে অত উচু পাড়ে উঠিতে পারিলেন না, এমন সময়ে অদূরে একটি কুমীর "ভুস্" করিয়া উঠিল। ভুবন মোহন বুঝিলেন, এইবারই তাঁহার জীবন-লীলা সাঙ্গ হইল, আর পরমারাধ্যা মাতৃচরণ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান্‌কে পরিত্রাহি ডাকিতে লাগিলেন। যিনি ভক্ত প্রহ্লাদকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সাধুগণের পরিত্রাতা, সেই লীলাময়ের লীলা কে বুঝিবে? যেমনই নিকটে কুমীর ভাসিয়া উঠিল, অমনই ভুবন মোহনের দুই পার্শ্বে ধলেশ্বরীর উচ্চ পাড় বসিয়া পড়িল। ভগবান্ বুঝি ভক্ত ভুবন মোহনের প্রাণ রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা করিলেন, ভুবন মোহন সেই বিধ্বস্ত পাড়ে ভর দিয়া পুনরায় চরের উপরে উঠিলেন। তাঁহার বস্ত্রাদি সব ভিজিয়া গিয়াছিল, তারপর আবার শীতল বাতাস বহিতেছিল, তখন তিনি দুই হাঁটু বুকে দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে একান্ত মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশতলে সেই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রজনীতে ভীষণ শব্দায়মানা উত্তাল তরঙ্গায়িতা ধলেশ্বরী-তটে একাকী ভুবন মোহন ঝঞ্ঝাবাতক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে সিক্ত বস্ত্রে বসিয়া

ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাক্লিষ্ট হইলেন, এবং সেই বালুকার উপর শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। শেষ রাত্রেই আকাশ সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষে বালসূর্য্যের স্বর্ণচ্ছটা ভুবন মোহনের বদন চুম্বন করিলে, তিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, আর সে দুর্য্যোগ নাই, প্রকৃতি হাস্যময়ী, আকাশ নির্ম্মল, ধলেশ্বরী আর তরঙ্গায়িতা নহে,—সে এখন প্রসন্নসলিলা প্রশান্তা! তখন তিনি ধীরে ধীরে খেয়াঘাটে গেলেন। পূর্ব্বদিন বৈকালে খেয়া নৌকার মাঝি ঝড়ের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সেও নৌকা লইয়া আসিল। ভুবন মোহন তাহাতে ধলেশ্বরী পার হইলেন।

এদিকে জননী বাড়ীতে বড়ই চিন্তিতা হইয়াছেন। ভুবন মোহনের শনিবার রাত্রি বাড়ী যাইবার কথা; কিন্তু বৈকাল বেলা ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ, উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত ভুবন ঝড় বৃষ্টিতে পড়িয়াছে। যদি পথে কোন মানুষের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহা হইলে রক্ষা, নতুবা যে দারুণ বিপদ; পথও দীর্ঘ, তাহাতে আবার তিনটী নদী পার হইতে হয়, নদীর মধ্যে তুফানে পড়িলে কি আর রক্ষা আছে? তখন তিনি ভুবন মোহনের কল্যাণ-কামনায় ভগবান্‌কে কতই ডাকিলেন। কতই হরির লুট, শাল গ্রামের ভোগ, মঙ্গল চণ্ডী ও উদ্ধার-চণ্ডীর পূজা, ইন্দ্র বৈষ্ণবকে দৈ খৈ ও মা গঙ্গাকে লবণ মানসা করিলেন। সন্ধ্যাব পর ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। মাতা পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই ভুবন মোহনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটী পত্রপাত-শব্দও তাঁহার নিকট ভুবন মোহনের পদ-শব্দ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে কোন একটুকু শব্দ পাইলেই

"ঐ বুঝি আমার ভুবন আসিতেছে" বলিয়া বাতি লইয়া ঘরের বাহির হইতে লাগিলেন। বাটীস্থ সকলেই ভুবন মোহনকে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। জয়চন্দ্র একবার রাস্তা ধরিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত গেলেন। জননী মনে করিলেন জয়চন্দ্র এবার ভুবনকে সঙ্গে লইয়া ফিরিবেন। কিছুক্ষণ পরে জয়চন্দ্র নিরাশ মনে একাকী বাড়ী ফিরিলেন। তখন জননীর হৃদয় আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্রমে রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল ব্যাকুলতা ততই বাড়িতে লাগিল। এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতেও ভুবন মোহনের দেখা নাই। জননী একবার মনে করিলেন "হয়ত ভুবন কাল ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া রওনা হয় নাই।" আবার মনে হইল "তাহা কখনই হইতে পারে না। সে যে আমার কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। যখন সে আমার কাছে লিখিয়াছে, শনিবার দিন বাড়ী আসিবে, তখন সে নিশ্চয়ই রওনা হইয়াছিল; বুঝি পথে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে।" তিনি এই বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে নানারূপ সান্ত্বনা করিয়া কহিল, "তুমি কান্দিও না, তোমার ভুবন অবোধ নয়, হয়ত সে ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া আদৌ রওনাই হয় নাই, অথবা পথে কোন-স্থানে রাত্রে ছিল, আজ হয়ত আসিবে।" জয়চন্দ্রও তাহাই মনে করিয়া ভাবিলেন, বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত দেখিয়া তিনি ভুবনের খোঁজে ঢাকা রওনা হইবেন।

বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া আসিয়াছে, জয়চন্দ্র ঢাকা রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, মাতা বিষণ্ণ মনে পথের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছেন, তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছে, এমন সময় বালুকা

ও কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রে ভুবন মোহন আসিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। জননীর হৃদয়ে অপার আনন্দ উথলিয়া উঠিল। অতঃপর জননী ঝড়-বৃষ্টির সময় ভুবন মোহন কোথায় ছিলেন? তাঁহার গায়ে ও কাপড়ে কাদা ও বালু লাগিয়াছে কেন? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পথের যাবতীয় দুর্ঘটনা একে একে বর্ণন করিলেন। মাতা ভুবন মোহনের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন, "বাবা আমি সর্ব্বনাশীই তোমার এই বিপদের মূল। আমি কেন মাটী খাইয়া তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম। আমি না লিখিলে তুমি আসিতেও না, তোমার এ বিপদও হইত না। আমি তোমার জন্য কত দেবতাকে মানসা করিয়াছি। ভুবন মোহন কহিলেন, "মা, তুমি কেন এত দুঃখ প্রকাশ করিতেছ? অমন দৈব দুর্ব্বিপাক অনেক সময়ই ঘটিয়া থাকে। তাহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল কি? তোমার আশীর্ব্বাদ থাকিলে আর ভয় কি? আমি তোমার আশীর্ব্বাদেই এবার বাঁচিয়া আসিয়াছি, মা!"

অতঃপর ভুবন মোহনকে মাতা স্নানাহার করাইয়া নিজে স্নানাহার করিলেন। পর দিন প্রত্যূষে ভুবন মোহন মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া পুনরায় ঢাকা রওনা হইলেন।

ইহার কিছুদিন পর অধ্যক্ষ মিঃ এরাটুন্ একদিন পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলিলেন, তাঁহার কন্যা ফিবি বাঙ্গালা পড়িবে, তাহার জন্য ছাত্রগণের মধ্য হইতে একজন চরিত্রবান্, বিনীত এবং ভাষাভিজ্ঞ ছাত্রকে তিনি শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চাহেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভুবন মোহনকেই এই সকল গুণান্বিত দেখিয়া তাঁহাকে

এ কার্য্যে নিযুক্ত করার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ভুবন মোহন মিস্ ফিবর শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যহ প্রাতে এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহার, সচ্চরিত্রতা ও শিক্ষাদান-প্রণালী দেখিয়া মিঃ এরাটুন্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অধ্যক্ষ সাহেবের কন্যার শিক্ষক হইয়াছেন, সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, ইহাতে অনেক ছাত্রেরই ঈর্ষা জন্মিল।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদিন মিঃ এরাটুন্ ক্লাশ পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, একটি ছাত্র তাঁহাকে দেখিয়া মুচকি হাসিতেছিল, হঠাৎ তিনি তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে সারাদিন বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিলেন। এই কঠোর দণ্ডবিধানে ক্লাশের ছাত্রবৃন্দ ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্যান্য ক্লাশেও সেই সংবাদ বিদ্যুৎ-বেগে প্রচারিত হইল। তখন ছাত্রগণ মধ্যে একতা ও সহানুভূতি যথেষ্ট ছিল। এই সংবাদে নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র-সমাজে দারুণ ক্ষোভের স্রোত প্রবাহিত হইল। যথাকালে স্কুল ছুটি হইলে ছাত্রগণ, বোর্ডিঙ্গে গিয়া এক বৈঠক করিল। তাহাতে স্থিরীকৃত হইল আর কেহ বোর্ডিংএ থাকিবে না। ভুবন মোহন এ সিদ্ধান্তে একমত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, যাঁহার মত হয় তিনি বরং যাউন কিন্তু অন্যকে যাইতে বাধ্য করিবেন না। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। বরং নেতৃদলের কেহ কেহ তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিয়া বলিল, "তা তুমি যাইবে কেন? তুমি যে অধ্যক্ষের প্রিয় ছাত্র, তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার শিক্ষক!" এই বলিয়া নেতৃগণ বোর্ডিং পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইল এবং যে সকল ছাত্র ইতস্ততঃ

করিতেছিল তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক, টানিয়া লইয়া বোর্ডিঙ্গের বাহির হইল। তাহারা বাহির হইবার সময় ভুবনমোহনকে বলিয়া গেল, "দেখ ভুবন! তুমি যদি আমাদের সঙ্গে না আইস তবে তোমার সহিত আমাদের আর সম্বন্ধ থাকিবে না, কেহ আর তোমার সহিত কথাও বলিব না।"

সকলে বাহির হইয়া গেলে, ভুবন মোহন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি একাকী সেই নির্জ্জন গৃহে থাকিবেন কিরূপে? আর সমপাঠিগণের সহানুভূতিতে বঞ্চিত হওয়াও অতীব দুঃখের বিষয়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন "অন্যেরও যে গতি আমারও সেই গতি।" তখন তিনিও বোর্ডিং পরিত্যাগ করিয়া অপর ছাত্রগণের অনুবর্ত্তী হইলেন। অতঃপর ছাত্রগণ একটা মেস্ করিয়া থাকিল।

ছাত্রগণ বোর্ডিং ছাড়িয়া আসিবামাত্রই সে সংবাদ তড়িদ্বেগে অধ্যক্ষ সাহেবের কর্ণগোচর হইল। পরদিন স্কুলে তিনি ছাত্রগণকে ডাকাইয়া তাহাদের বোর্ডিং ছাড়িয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিল, বোর্ডিঙ্গে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়, তাই তাহারা বোর্ডিং ছাড়িয়াছে। সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা আমি তোমাদের ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি, তোমরা বোর্ডিঙ্গে ফিরিয়া আইস।" ছাত্রগণ কহিল,—"আপনি শত ভাল বন্দোবস্ত করিলেও আর আমরা বোর্ডিঙ্গে যাইব না। আমাদের বন্দোবস্ত আমরাই করিয়া লইব।" ছাত্রগণের এই উত্তরে সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে রুক্ষস্বরে কহিলেন. "তোমরা এখনও বল কেন বোর্ডিং ছাড়িয়াছ? নতুবা সকলেই ইহার জন্য বিশেষ শাস্তি ভোগ করিবে।" এইবার

ছাত্রগণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয়ের বল বিদূরিত হইল; যিনি ছাত্রাবাস পরিত্যাগে ছাত্রগণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, সেই নেতা মহাশয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাহেবের সম্মুখস্থ ব্যাইবেল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আমি এই বাইবেল স্পর্শ করিয়া বলিতেছি আমি ইহার কিছুই জানি না। গত কল্য স্কুল ছুটির পর বোর্ডিঙ্গে গিয়া দেখি কয়েকজন ছাত্র বোর্ডিং পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারা বলিতেছে তাহারা মেস্ করিয়া থাকিবে। এই বলিয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রগণও তাহাদের অনুগামী হইল। আমি একাকী বোর্ডিঙ্গে থাকিতে না পারিয়া অগত্যা বাসায় চলিয়া গেলাম।" সাহেব ভাবিলেন বালকটি খুব সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক, নহিলে পবিত্র বাইবেল স্পর্শ করিয়া কথা কহিবে কেন? বালকটি যে মনে করিয়াছিল, সে হিন্দু,—বাইবেল তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র নহে এবং সেই জন্য সে সাহেবকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহা কিন্তু সাহেব বুঝিলেন না। সাহেব আর কয়েকজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কহিল, "অমুক অমুকে আগে বাহির হইয়াছিল আমরা তাহাদের কথায় বাহির হইয়াছিলাম।"

অতঃপর সাহেব ভুবন মোহনকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে সত্যনিষ্ঠ ও সাধু-প্রকৃতি বলিয়া জানি। তুমি কেন ইহাদের সঙ্গে যোগ দান করিলে?" সত্যনিষ্ঠ ভুবন মোহন বলিলেন, "আমি বিদ্রোহী-দলে যোগদান করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বিদ্রোহের সূচনা করা আমার অভিপ্রেত ছিল না। আমি সকলকে বোর্ডিং ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলাম কিন্তু কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই।

সকলে চলিয়া গেলে আমি একাকী বিরূপে থাকি, তাই অগত্যা আমিও তাহাদের সঙ্গে অন্যত্র গিয়াছিলাম।"

অধ্যক্ষ। কাহার কথায় বোর্ডিং ছাড়িলে?

ভুবন। ব্যক্তি বিশেষের কথায় না। সমুদায় ছাত্র পরামর্শ করিয়াই বোর্ডিং পরিত্যাগ করিয়াছে।

অধ্যক্ষ। এখন বল দেখি কি জন্য বোর্ডিং ছাড়িলে?

কেহই কোন উত্তর দিল না। তখন নির্ভীক ভুবন মোহন বলিলেন, "আপনি অসন্তুষ্ট না হইলে বলিতে পারি।" সাহেব বলিলেন, "বল।"

তখন ভুবন মোহন কহিলেন, "যাহারা দু'দিন পরে শত শত ছাত্রের উপর প্রভুত্ব করিবে, শিক্ষক বলিয়া বরণীয় হইবে, আপনি গত কল্য তেমন একটী বয়স্ক ছাত্রের প্রতি অপমান সূচক দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন তাহাতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে।"

অধ্যক্ষ সাহেব, এই তেজোগর্ভ বাক্যে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকেই বিদ্রোহিগণের অধিনায়ক বলিয়া স্থির করিলেন। এবং সেই বাইবেলস্পর্শকারী সাহেবের সত্যবাদী ছাত্র ব্যতীত, ভুবন মোহন প্রমুখ সমুদায় ছাত্রকে জরিমানা করিলেন। ভুবন মোহনের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি ভুবন মোহনকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

সাহেবের চক্ষে তিনি মিথ্যাবাদী হইলেও, শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিকট, এই ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক বলিয়া বরণীয় হইলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে অধিকতর স্নেহ করিতে লাগিলেন।

অধ্যক্ষ সাহেবের কোপদৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভুবন মোহন পূর্ব্বের ন্যায় মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলেন। তখন তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার শিক্ষা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাকে প্রথম বা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সাহিত্য পড়াইতে দিয়া পরীক্ষা করিতেন। ভুবন মোহনের অপূর্ব্ব শিক্ষা-দান-প্রণালী এবং সুললিত হৃদয়-গ্রাহী ব্যাখ্যা শুনিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও ছাত্রগণ মুগ্ধ হইতেন। কোন স্থানে আধ্যাত্মিক ভাবের কথা থাকিলে নিজেও ভগবৎ-প্রেমে ডুবিয়া যাইতেন এবং ব্যাখ্যায় ছাত্রগণের হৃদয়েও ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিতেন। অতঃপর যথাসময়ে তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় অতি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

ভুবন মোহন এক্ষণে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছেন। এইবার তাঁহার শেষ পরীক্ষার বৎসর। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাঁহার বিদ্বেষ্টা এরাটুনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া পারিবারিক সাহায্যের চেষ্টা করিতে পারেন। মনোযোগী ভুবন মোহন অধিকতর মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার খেলা-বেড়ান কিছুই ছিল না, ছিল কেবল পড়া আর ধর্ম্মনিষ্ঠা। অন্যান্য ছাত্রগণ কোন স্থানে নর্ত্তকীর নৃত্যগীত হইতেছে শুনিলে তথায় ছুটিত, ভুবন মোহন যাইতেন না। কিন্তু তিনি যদি শুনিতেন অমুক স্থানে ভাগবত কি মৌলদসরিফ পাঠ হইবে, কি ব্রাহ্ম বা খৃষ্ট ধর্ম্মের বক্তৃতা হইবে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত হইতেন এবং বক্তৃতা বা পাঠ শেষ না হইলে উঠিতেন না। এজন্য তাঁহার সমপাঠিগণ তাঁহাকে অনেক সময় উপহাস করিত।

একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন, ব্রজসুন্দর ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেষ্টা সাধু অঘোর নাথ গুপ্ত "শুভ-সমিতি" নামে একটী ছাত্র-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতি শনিবার উহার অধিবেশন হয়, এবং সাধু তাহাতে গীতা ও উপনিষদের মর্ম্মানুসারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বক্তৃতা করেন। ইহা শুনিয়া ভুবন মোহন শনিবার স্কুল ছুটির পর, "শুভ-সমিতিতে" গিয়া যোগদান করিলেন। সাধু অঘোর নাথের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায়

তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি ব্রহ্মভাবে বিভোর হইয়া সভা-ভঙ্গের পর বোর্ডিঙ্গে প্রত্যাগত হইলেন।

আজ তাঁহার মুখখানি গম্ভীর, কাহারও সহিত তেমন বাক্যালাপ করেন না। মন যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। নেত্রদ্বয়ে প্রেমাশ্রু ছল ছল করিতেছে। ছাত্রগণের অনেকেই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু কহিলেন না। কেহ কেহ অনুমান করিল, তিনি বাড়ীর কোন অমঙ্গলসূচক সংবাদ পাইয়াছেন, কেহ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়সিন্ধু যে আজ ভগবৎ-প্রেমে বিক্ষোভিত হইয়াছে তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিল না। 'ব্রহ্মের স্বরূপ কি? কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়? কিরূপে সেই অব্যক্ত অচিন্ত্য ব্রহ্মের পাদপদ্ম লাভ করা যায়?' এই সকল চিন্তায় তিনি আত্মহারা হইলেন। সাধু অঘোর নাথের অমূল্য উপদেশগুলি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। আবার কখন্ সে উপদেশ শুনিতে পাইবেন, আবার কখন্ সে ব্রহ্মামৃত পান করিবেন, ইহাই সতত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরদিন ব্রাহ্মসভায় সাধু অঘোরনাথ বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া, ভুবন মোহন সর্ব্বাগ্রে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দলে দলে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ সভাগৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রথম কয়েকটি কীর্ত্তন হইল; তারপর সাধু অঘোরনাথ উপাসনা করিলেন। ভুবন মোহন স্তিমিত নেত্রে ও নিস্পন্দভাবে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষে প্রেমধারা প্রবাহিত হইল, ক্ষণে ক্ষণে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

সাধু অঘোরনাথ নবীন যুবকের এই প্রেমভাব দর্শন করিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল, সকলে প্রস্থান করিলেন। ভুবন মোহন একেবারে প্রেমে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, বাহ্যজ্ঞান তখন তাঁহার লোপ পাইয়াছিল, সভ্যগণ যে চলিয়া গেলেন, ভুবন মোহন তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি বহ্মভাবে বিভোর হইয়া অনবরত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাধু অঘোরনাথ, ব্রহ্মানন্দ ভুবন মোহনের প্রেমোন্মাদনা দেখিয়া চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর ভুবন মোহনের বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি দেখিলেন, সেখানে আর কেহ নাই, আছেন কেবল সাধু অঘোর-নাথ। তিনি এতক্ষণ সুদুর্লভ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছিলেন, কোন কথা কহিলে তিনি সে আনন্দে বঞ্চিত হইবেন, এজন্য সাধু এতক্ষণ তাঁহাকে কিছু বলেন নাই। এক্ষণে তাঁহরে বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "সকলে চলিয়া গিয়াছে তুমি এতক্ষণ রহিয়াছ কেন?" ভুবন মোহন সজল নয়নে বলিলেন, "আপনার নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে, যদি কৃপা করিয়া এ অধমের কথায় কর্ণপাত করেন তবে বলিতে পারি।" সাধু কহিলেন, "কি?" ভুবন মোহন বলিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করুন।" এই কথা শুনিয়া সাধু আঘার নাথ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তোমার কথায় আমি প্রকৃতই সন্তোষ লাভ করিলাম। কিন্তু আমি ব্রহ্মতত্ত্বের কি জানি যে তোমাকে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিব? তবে যথাসাধ্য দুই একটি কথা বলিতেছি, শুন, "দীক্ষা দুই প্রকার; আন্তর দীক্ষা ও বাহ্য দীক্ষা। আন্তর দীক্ষা হয় প্রাণে, বাহ্য দীক্ষা হয় কাণে। মানুষের মন স্বভাবতঃই বহির্মুখ—মনের সেই

অবস্থা ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখ করাই দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইলেই মন শুদ্ধ ও স্বচ্ছ আকার ধারণ করে, তখন সেই নির্ম্মল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়। ধর্ম্ম-ভাবোজ্জ্বল পবিত্র হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতির যতই স্ফুরণ হইতে থাকে, ততই মন সেই জ্যোতির্ম্ময়ে মিশিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। ইহাই মনের অন্তর্ম্মুখ অবস্থা। মন অন্তর্ম্মুখী হইলে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া মনেতে বিলীন হইয়া যায়। বাহ্যজ্ঞান রহিত মন আত্মলীন হইয়া জ্ঞানের আকারেই বিভাত হইতে থাকে, তখন অন্তর্য্যামী পরমাত্মা মানবকে প্রাণে প্রাণে দীক্ষিত করিয়া আপনার চিদানন্দ রসের আভাস প্রদান করেন। যেমন ফুলের গন্ধে আকুলিত হইয়া ভ্রমর ধাবিত হয়, অনলের জ্যোতিঃ দেখিলেই পতঙ্গ যেমন তাহাতে মিশিতে চায়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ রসের আভাস পাইলেই মনও তাহাতে মিশিবার জন্য ব্যাকুল হয়। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনের জন্য মনের এই ব্যাকুলতার নামই প্রেম। হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইলে তাহার আর আত্মদর্শনের বিলম্ব থাকে না। তোমার লক্ষণাদি দেখিয়া বুঝিলাম তোমার প্রাণের দীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর কাণের দীক্ষার প্রয়োজন নাই। তোমার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে অতএব অবিলম্বেই আত্মদর্শন করিবে সন্দেহ নাই। পরমাত্মারূপী ভগবান্ সর্ব্বদাই জীবাত্মাকে উপদেশ দিতেছেন, ইহাই মনীষী আর্য্য ঋষিদের মত। মানবের মন স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ বলিয়া তাহা শুনিতে পায়না। মন ন্যায়ের বিধি লঙ্ঘন করিয়া যখন পাপানুষ্ঠানে রত হইবার জন্য কুপথে ধাবিত হয় তখন প্রথম প্রথম, "এরূপ আচরণ করিওনা, ইহা অন্যায়,"

এইরূপ অন্তর হইতে একটা নিষেধাজ্ঞা বা ভয়ের ভাব আসিয়া থাকে। সৎকার্য্যে রত হইবার জন্য স্বভাবতঃ মনে উৎসাহ ও আনন্দের উদয় হয়। কে যেন বলিয়া দেয়, "ইহা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" যাহা হইতে ধর্ম্মপথে চলিবার প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান সঞ্জাত হয় তিনিই পরমাত্মা। এবং ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তির জ্ঞানকেই ঈশ্বরবাণী বা বিবেকবাণী বলিয়া জানিবে। অন্তর্ম্মুখ হইয়া যতই আত্মধ্যান পরায়ণ হইবে, ততই উহা পরিস্ফুট রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া, সর্ব্বদা আত্মস্মরণ ও ধ্যানযোগে এই বিবেককে জাগ্রত রাখিবে। এই বিবেকই ব্রহ্মাগ্নি উদ্দীপিত করিয়া অজ্ঞান-মহান্ধকার বিনাশ করতঃ আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানে হৃদয় প্রবুদ্ধ হইলেই পরমাত্মা লাভের জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। তখন এক পরব্রহ্ম পরমাত্মা ব্যতীত সংসারের কোন বিষয়েই তাহার আর আকাঙ্খা থাকে না। সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া মন নির্ব্বিকারত্ব লাভ করিলেই প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত বিবেক-নেত্রে হৃদয়-মন্দিরেই প্রেমাধার প্রিয়তম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সতত হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি-শিখা জ্বলিতে থাকে। তোমার অন্তঃকরণে সেই ব্রহ্মাগ্নি প্রধূমিত হইয়াছে, সুতরাং বাহ্য দীক্ষায় তোমার প্রয়োজন কি? যখন বহুভাগ্য-বলে, বাসনা ক্ষয়ান্তে, পরমাত্মার দর্শন ঘটে, জীবাত্মার ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়, তখন মন ও আত্মা এক হইয়া যায়, আমিত্ব ডুবিয়া যায়, তখনই মানুষের সমাধি হয়।

আত্মা ও পরমাত্মার মিলনই সমাধি। সেই ভাব কিরূপ, তাহা কেহ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মা এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-রসে নিমগ্ন হইয়া, আনন্দাকারে প্রতিভাত হইতে থাকে। হৃদয়ে অখণ্ড আনন্দ-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। সর্ব্বাঙ্গে কেবল পুলক-লহরী খেলিতে থাকে, হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, এবং ব্রহ্মজ্যোতিঃ ফুটিয়া মুখকান্তি সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। এই অবস্থায় পৌছিলে মানুষ ব্রহ্ম দর্শন বা আত্মদর্শন করে।

বহির্ম্মুখ মনে কখনও ঈশ্বরতত্ত্ব স্থান পায় না। সময় সময় চঞ্চল বিজলীর মত ব্রহ্ম-ভাবের আলোককণা দেখা দিলেও আবার তখনই তাহা অন্তর্হিত হয়, আবার মোহান্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে, বিবিধ বিষয়-বাসনা উপস্থিত হইয়া, বিষয়-ভোগের জন্য মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে। চঞ্চল মনে ভগবদ্ভক্তি স্থান পায় না, ঈশ্বরচিন্তাপরায়ণ হইলেও সেদিকে মন ধাবিত হয় না। নানা সন্দেহ আসিয়া মনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে। আপনা হইতে মনের সন্দেহ ঘুচে না। সন্দিগ্ধ মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস বা আত্মজ্ঞান জন্মে না। তাই মনের এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বহির্ম্মুখতা ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখতা সম্পাদনের জন্য সৎসঙ্গ বা গুরু গ্রহণ পূর্ব্বক দীক্ষার প্রয়োজন।

"সবহি ঘটমে হরি বৈসে যেঁও গিরি সুতলে জ্যোতিঃ
জ্ঞান গুরু চকমক্ বিনা কৈসে প্রকটহোতি ॥"

যেমন চকমকি প্রস্তর মধ্যে, প্রচ্ছন্ন ভাবে অগ্নি থাকে, সেইরূপ হরি

আত্মরূপে সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিরাজমান আছেন। চকমকি পাথরে যেমন আঘাত না করিলে অগ্নি বাহির হয় না, সেইরূপ জ্ঞান গুরুর উপদেশ ব্যতীত ভগবান্ প্রকাশিত হন না।

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ,
তব কয়লাকি ময়লা ছুটে, যব আগ করে পরবেশ।"

অঙ্গার সম্ভবতঃ মলিন,—শত চেষ্টাতেও তাহার মলিনত্ব দূর হয় না, একমাত্র অগ্নি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেই তাহার মলিনত্ব ঘুচিয়া যায়, সেই-রূপ মানুষের মনও বিষয়-বাসনায় মলিন হইয়া থাকে, কেবল সদ্‌গুরুর জ্ঞানোপদেশে তাহার মলিনত্ব দূর হয়,—মনের সকল সন্দেহ, ভেদ-বুদ্ধি ও অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া যায়। তখন জ্ঞানালোক লাভ করিয়া মন উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

"অনেক-জন্ম-সংস্কারাৎ শ্রীগুরুরোশ্চ কৃপাবশাৎ।
প্রত্যক্ষশ্চ পরোক্ষশ্চ বিবেকঃপ্রাপ্যতে বুধৈঃ ॥
ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

অনেক জন্মের সংসিদ্ধি লাভ করিয়া উপদেষ্টা গুরুর কৃপায় বুধগণই একমাত্র পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞান লাভের পরই ব্রহ্মদর্শন। সেই পরম ব্রহ্মের স্বরূপ পরাপর পরমাত্মাকে দর্শন মাত্র মানবের হৃদয়-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়। সকল সংশয় দূরে যায় এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মানব মুক্তি লাভ করে।

আন্তর দীক্ষা বা প্রাণের দীক্ষা বিষয়াসক্ত মানবের ঘটা অসম্ভব।

বাল্য হইতে যাহার মন বিষয়ে অনাকৃষ্ট ও সর্ব্ববিধ দোষ মল-পরিশূন্য থাকে, তাঁহার সেই পবিত্র হৃদয়েই সতত জ্যোতির্ম্ময় আত্মার জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়; এবং তাদৃশ অপাপবিদ্ধ মহাত্মাদেরই প্রাণের দীক্ষা হইয়া থাকে। যাহাদের মন বহির্ম্মুখ ও বিষয়াসক্ত,—ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত হয় না,—তাহাদের উপদেষ্টার প্রয়োজন। ব্রহ্মতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের উপদেশে তাহার বিষয়াসক্তি বিনিবৃত্ত হইলে মন অন্তর্ম্মুখ হইয়া আত্মানুসন্ধানে রত হয়, এবং অচিরকাল মধ্যে বিবেক লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। তখন সে বিবেকবলে জানিতে পারে এক অনাদ্যন্ত পরমব্রহ্মই নিত্য ও সত্য, তদ্ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা ও অনিত্য। পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাভ্যাস ও তত্ত্বালোচনা দ্বারা সকল সন্দেহ দূরীভূত হইলে ব্রহ্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। কাহারও বা একমাত্র জ্ঞানীর উপদেশই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া থাকে। তখন ভোগ-বিলাসের উপকরণ উপস্থিত হইলেও ক্ষণিক ও অনিত্য বোধে সে তাহাতে আসক্ত হয় না। ব্রহ্মই একমাত্র অবলম্বন মনে করিয়া সতত ব্রহ্ম-তত্ত্বানুশীলনেই রত থাকে। পরিশেষে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার আত্মাতেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ সত্তার উপলব্ধি করিতে পারে। সর্ব্বজীবে একই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বিরাজিত আছেন, দেখিতে পায়। তখনই তাহার হিংসা, দ্বেষ, আত্মপর ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় এবং আত্মপ্রীতি বিশ্ব প্রীতিতে পরিণত হয়। তখনই জানিতে পারে আমার আত্মা এই ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড মধ্যে আবদ্ধ নহে,—তিনি বিরাট্ বিশ্বের ব্যষ্টি দেহে অনন্ত জীবরূপে বিচরণ করিতেছেন। সেই বিশ্বপ্রাণ বিরাট্ ব্রহ্মের প্রীতি ও সন্তোষ সম্পাদন করিতে পারিলে পরব্রহ্মের প্রীতি সাধন করা হয়।

ইহারই নাম পরা-প্রীতি। ইহা দ্বারা ব্রহ্মগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমে দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে আপনার আত্মাতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে হয়, তৎপর বিবেক ব্রহ্মদর্শন সংঘটিত হয়। সর্ব্ব জীবে ব্রহ্মভাব উপলব্ধিই প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন।

ব্রহ্ম লাভের তিনটি পন্থা প্রধান,—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি; কিন্তু তিনটিরই মূলমন্ত্র ত্যাগ। বাহ্য বস্তুর ত্যাগকে ত্যাগ বলা যায় না। মন হইতে সর্ব্বতোভাবে বিষয়াসক্তি বা বাসনার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, আর সব ভাণ। যাহা দ্বারা পরব্রহ্মে যুক্ত হওয়া যায়, তাহাই যোগ। উক্ত ত্রিবিধ যোগেই ত্যাগের প্রয়োজন। কর্ম্মযোগিগণ ক্রমশঃ অভ্যাস ও সংযম দ্বারা ত্যাগ অবলম্বন করেন। জ্ঞানীরা জ্ঞান দ্বারা,ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই অনিত্য ভাবিয়া ব্রহ্মতেই আসক্তি স্থাপন করেন,—ব্রহ্ম ব্যতীত ভ্রমেও বিষয়-বাসনা মনে স্থান দেন না। আর ভক্তগণ, ভগবান্ই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তদ্ব্যতীত আনন্দের বস্তু দ্বিতীয় নাই, এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া কেহবা তাঁহাকে প্রভুভাবে, কেহ মাতৃভাবে, কেহবা পিতৃভাবে তদ্গত হইয়া আপনার প্রাণ, মন, আশা, বাসনা ও দেহাদি সমস্ত তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহারই উপাসনায় রত থাকে। অতএব ত্যাগই ব্রহ্ম-লাভের একমাত্র উপায়।

ভোগেই আসক্তি;—ভোগেই বিরক্তি। ভোগাসক্ত মহাপাপীরাও বিষয় ভোগে আসক্ত হইলে মুক্তি পদারূঢ় হইয়া থাকে। আত্মা, সদাচিদানন্দময়। আত্মার লক্ষ্য, আনন্দ। বিষয়ে আনন্দ আছে; আত্মায়ও আনন্দ আছে। বিষয়ের আনন্দ অনিত্য, আপাতমধুর, পরিণামে বিরস; আর আত্মার আনন্দ অনন্তকালস্থায়ী। বিষয়ের আকর্ষণ আছে,—

আত্মার আছে মহাকর্ষণ। উভয় আকর্ষণের মধ্যবর্ত্তী,—মন। বিষয়াকর্ষণের নাম,—আসক্তি; আত্মার আকর্ষণের নাম,—ভক্তি। বিষয়ের আনন্দ সন্নিধিমাত্রই অনুভূত হয়; আত্মার আনন্দ আরাধনা-সাপেক্ষ। অনাদি অনন্তকাল হইতে জীব আনন্দের জন্য লালায়িত। মন ও ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ। শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হইলেই মন বিষয়ের ক্ষণিক সুখস্পর্শে মোহিত হইয়া ভোগাসক্ত হইয়া পড়ে। সম্মুখে বিষয় বিভব,—ভোগবিলাসের অশেষ উপকরণ দেখিতে পাইয়া, সুখের আশায় তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সেইদিকে ধাবিত হয়। ভোগে আসক্তি, তাহার পরই বিরক্তি। দেশ কাল পাত্র ভেদে একই বিষয়ে কখন আসক্তি কখন বা বিরক্তি উপস্থিত হয়। বাল্যে যাহা রুচিকর, যৌবনে তাহাতেই বিরক্তি; যৌবনে যাহাতে আসক্তি, বার্দ্ধক্যে তাহাতে বিরক্তি; সুস্থাবস্থায় যাহা প্রীতিকর, রুগ্নাবস্থায় তাহা বিরক্তিকর; শীতে যাহা প্রীতিকর, গ্রীষ্মে তাহাই বিরক্তিকর; এমন কি এখন যাহা প্রীতিকর, পরক্ষণেই তাহা বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। মন যতদিন বহির্মুখ থাকে, ততদিনই সুখের অন্বেষণে লালায়িত হইয়া এটা ওটা নানা বিষয়ে বিচরণ করিতে থাকে, কিন্তু কোনটাতেই প্রকৃত সুখ পায় না। মোহ বশতঃ আবার তাহাতেই লিপ্ত হইয়া এক একটী গ্রহণ করে এবং পরক্ষণেই বিরক্ত হইয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কিছুতেই সুখের আশা মিটেনা। এইরূপ সুখের জন্য অবিরত ছুটাছুটি করিয়া, সংসারে অশেষ লাঞ্ছনা ও যাতনা ভোগ করিয়া পুনঃপুনঃ আশায় বঞ্চিত হইতে থাকে,—অবশেষে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন সেই আপাত-

মধুর বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরক্তি আসিয়া পড়ে; তখন একে একে বিষয়-সংস্রব ত্যাগ করিতে থাকে। সুখের আশায় বঞ্চিত হইলে নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য দ্বারা মন বিষয়াসক্তি-শূন্য নির্ব্বিকার হইলেই বিবেকের উদয় হয়। ভোগ-বাসনা ত্যাগই শান্তির কারণ, গীতা বলিয়াছেন,—

"আপূর্য্য মাণমচল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি নকামকামী॥"

'নদী প্রবাহ সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন জল পূর্ণ হইয়া স্থির ও অচঞ্চল ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ কামনা সকল যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থির ভাবে থাকে তিনিই শান্তি লাভ করেন।' ভোগাভিলাষী ব্যক্তি শান্তি লাভ করিতে পারেন না। কামনা দ্বারাই হৃদয় অস্থির ও বিচলিত হয়। কামনা ত্যাগ করিতে না পারিলে হৃদয় শান্ত হয় না। অশান্ত ও অস্থির হৃদয়ে বিবেক আসিতে পারে না, সুতরাং বিষয় বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলেই বৈরাগ্য এবং তাহা হইতেই হৃদয় শান্ত হয়। শান্ত ও সুস্থির হৃদয়েই বিবেকের উদয় হয়। মানব যখন বিবেক-বলে নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা বুঝিতে পারে, বিষয় অনিত্য ও দুঃখের মূল, এবং আত্মাই একমাত্র নিত্য শান্তির আলয়, তখন বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হয়। বিষয়ের আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই, আত্মার মহাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মন আত্মাতেই যুক্ত হইয়া যায়। আত্মার এই আকর্ষণই তাঁহার কৃপা বা ভক্তি। তাঁহার কৃপা

ভিন্ন ভক্তি হয় না, এবং ভক্তি ভিন্ন তদীয় ধামে সত্বর প্রবেশ করা যায় না। মন বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে বিষয়ে প্রবেশ করে, আবার আত্মায় আসক্ত হইলে আত্মাতেই প্রবিষ্ট হয়। যাহার প্রতি যাহার যত আকর্ষণ, আসক্তি,—ভালবাসা আছে, সে তত আপনার হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিতেই ভগবান আপনার হন। কেহ তাঁহাকে প্রভুভাবে, কেহ পিতৃ ভাবে, কেহ বা মাতৃভাবে ভক্তি করিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া ভক্তি দ্বারাই তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইবার সহজ উপায়। সুতরাং তোমার যখন সেই ভক্তির উদয় হইয়াছে তখন আর তোমার দীক্ষার প্রয়োজন কি? তোমাকে পূর্ব্বে ত্যাগের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে আর একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

"ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলং দয়াশ্মৃতা।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন দয়া ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ॥"

'ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যার মূল, এবং দয়াই ধর্ম্মের মূল, অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে দয়া-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।' কামনা ও হিংসাই পাপের মূল। এই দুইটী সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য ও দয়া এই দুইটী গ্রহণ করিবে, তাহা হইলেই হৃদয়ে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।"

ভুবন মোহন যে জ্ঞানের জন্য এতদিন ব্যাকুল ছিলেন, সাধু অঘোর নাথের উপদেশে আজ তাঁহার সে আশা মিটিল। জীবনের সার ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্মের সার দয়া এবং ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য জানিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, এবং নিয়মিত রূপে ব্রাহ্ম-মন্দিরে গিয়া উপাসনায় যোগ দান করিতে লাগিলেন।

সাধু অঘোর নাথের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ

শ্রবণে ভুবন মোহন এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে অবসর পাইলেই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন,—তাঁহার নিকট গিয়া তত্ত্বকথা শুনিতেন। সাধুর উপদেশ গুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে প্রয়াসী হইলেন। ক্রমে সাধনা বলে তাহার হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাব যতই বদ্ধমূল হইতে লাগিল, ততই ধর্ম্ম-চর্চ্চায় তিনি লালায়িত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্ম সভা ব্যতীতও খ্রীষ্টানের গির্জ্জায়, মুসলমানের কোরাণ পাঠে ও হিন্দুর পুরাণ পাঠে তিনি উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত তত্ত্বকথা শুনিতে লাগিলেন।

বাল্যকাল হইতে ভুবন মোহনের হৃদয়ে দয়ার মন্দাকিনী প্রবাহিতা ছিল,—দরিদ্রের দুঃখে, রোগীর আর্ত্তনাদে ও বিপন্নের হাহাকারে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যথিত হইত,—কোন সমপাঠী বা প্রতিবেশী পীড়িত হইলে তিনি গিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেন। ওলাউঠা-বসন্ত প্রভৃতি যে সকল রোগে আত্মীয় স্বজনেরাও রোগীর নিকট যাইতে চাহে না, তিনি অম্লান বদনে সেই সকল রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। কেহ কোন বিপদে পড়িলে তিনি প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিতেন। অন্ধ, খঞ্জ, আতুর বা দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি তাঁহার শেষ সম্বল পর্য্যন্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক্ষণে অঘোর নাথের উপদেশে তাঁহার সেই দয়া-মন্দাকিনীতে বান ডাকিল।

ব্রহ্মচর্য্যেও তাহার পূর্ব্ব হইতেই অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি বাল্যকালে মাছ মারিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং মাছ না হইলে এক বেলাও খাইতে পারিতেন না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সহানুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মাতার সঙ্গে নিরামিষ ভোজন ও একাদশী করিতে আরম্ভ করেন। মাতা তাঁহাকে একাদশী ত্যাগ ও আমিষ ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলে, পরম মাতৃ ভক্ত ভুবন মোহন যাহ্ ছাড়িতে পারিলেন না। একাদশী সম্বন্ধে মাতাকে বলিলেন, "একাদশী করিলে শরীর সুস্থ থাকে ও দীর্ঘায়ু হওয়া যায় ইহাই অনেক মুনি ঋষি ও বৈজ্ঞানিকের মত, দ্বিতীয়তঃ তুমি মরিলে আমাকে ত একাদশী করিতেই হইবে, তা' এখন হইতে অভ্যাস করিলে তখন ততটা কষ্ট হইবে না। আর তখন একাদশী করিলেও তুমি দেখিতে পাইবে না, এখন দেখ, তোমার ভুবন একাদশী করিতে কাতর নহে। মা! আমি তোমার জন্য আর কিছু করিতে পারিব না, তবে তোমার একাদশী ও নিরামিষাহার পালন করিব।" একাদশী করিলে ভুবনের আয়ু বাড়িবে শুনিয়া, মাতা আর তাঁহার একাদশীতে বাধা দিলেন না; তিনি সেই হইতে বরাবর একাদশী পালন করিয়া আসিতে লাগিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে যখন মুমূর্ষু অবস্থায় কলিকাতায় চিকিৎসিত হইতেছিলেন তখনও তিনি একাদশী পালন করিয়াছেন, চিকিৎসকগণও তাঁহাকে যথা সাধ্য অনুরোধ করিয়া পথ্য খাওয়াইতে পারেন নাই।

অঘোরনাথের উপদেশের পর হইতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে জীব-হিংসা-মূলক আমিষাহার পরিত্যাগ করিবেন? কি প্রকারে ব্রহ্মচর্য্য-মূলক নিরামিষ আতপান্ন ভোজী হইবেন? কিরূপে কৌমার ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবেন? জননী যে তাহা কিছুতেই করিতে দিবেন না। জননীর আজ্ঞা অমান্য করিয়া ব্রতাবলম্বন করা

শ্রেয়স্কর মনে করিলেন না। তখন তিনি এই দুইটি ব্রতাবলম্বনের সুযোগানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার বাল্যকালের সেই প্রিয় খাদ্য মৎস্যের প্রতি একেবারে অশ্রদ্ধা জন্মিল। বাড়ীতে গেলে জননী মাছ আনাইয়া, নিজে মাছের ঘরে গিয়া, তাঁহার জন্য কত প্রকারের ব্যঞ্জন পাক করিতেন এবং খাওয়ার সময় নিজে গিয়া সম্মুখে বসিতেন, কিন্তু ভুবন মোহন কিছুই খাইতে পারিতেন না। মাতার অনুরোধে এক আধ টুকরা মাছ মুখে দিয়াই খাওয়া শেষ করিতেন, বলিতেন, মাছ তাঁহার ভাল লাগে না। ইহাতেও মাতা তাঁহাকে মাছ না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। অনেক সময় তিনি তাঁহাকে মাছ ধরিতেও অনুমতি করিতেন। ভূবন মোহন মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতেন। তিনি যখন দিনাজপুর মডেল স্কুলে শিক্ষক ছিলেন, তখন একবার বড়দিনের বন্ধে বাড়ী গিয়াছেন; মাতা তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় পুকুর হইতে কয়েকটি মাছ ধরিতে বলেন। ভুবন মোহন এক গাছা ক্ষেপলা জাল ও একটি হাড়ী লইয়া মাছ ধরিতে গেলেন। হাড়ীটি পুকুর-পাড়ে এক স্থানে বসাইলেন, এবং পুকুরের বিভিন্ন স্থানে মাছ ধরিয়া হাড়ীতে আনিয়া রাখিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে, কৃষ্ণ পক্ষের গাঢ় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি একবার মাছ রাখিতে হাড়ীর নিকট আসিয়া দেখেন একটা বাঘ আসিয়া হাড়ীর মাছ গুলি খাইতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। আর একদিন বৈকালে তিনি মাতৃ আজ্ঞায় মাছ ধরিতে গেলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে হঠাৎ তাহার জাল একটী খুটায় এরূপ ভাবে বাধিয়া গেল যে

সেই জাল ছাড়াইতে তাঁহাকে জলে ডুবিতে হইল। অতি কষ্টে জাল ছাড়াইলেও জাল গাছা ছিড়িয়া গেল। এদিকে পৌষ মাসের সন্ধ্যা বেলায় জলে ডুবিয়া তিনি শীতে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। অদূরে একটি বাড়ীতে আগুন জ্বলিতেছিল দেখিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। শীতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ অবশ হইয়াছিল যে, আগুনের তাপ কিছুই বোধ করিতে পারিতেছিলেন না। আগুনের নিকটে দাঁড়াইয়া হাত পা সেঁকিতে লাগিলেন, সেইসময় অগ্নিশিখা তাঁহার হাটুতে লাগায় ফোস্কা পড়িয়া উঠিল। পরে সেই ফোস্কা গলিয়া ঘা হইল; তিনি অনেকদিন সেই ঘায়ে কষ্ট পাইলেন। তিনি তখন বলিলেন প্রথমে ভগবান্ তাঁহাকে বুঝাইয়া ছিলেন, মৎস্য-মাংস, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরই খাদ্য, কিন্তু তাহাতেও তিনি প্রাণী-হিংসায় নিবৃত্ত না হওয়ায় ভগবান্ তাঁহাকে এই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। এবং প্রাণী-হিংসার যন্ত্র সেই জাল গাছটাও ছিড়িয়া দিয়াছেন। সেই অবধি মাতা আর কখনও তাঁহাকে মাছ ধরিতে বলেন নাই, কিম্বা আমিষ ভোজনের জন্য ও বিশেষ অনুরোধ করেন নাই। এইরূপে তিনি জীব হিংসার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু আতপান্ন ভোজী একাহারী হইতে পারিলেন না। তাঁহার সে সংকল্প জননী জীবিতা থাকিতে সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জননী পরলোক গমন করার পর তাঁহার সে সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। একবার তিনি প্রাণ-সংশয়-কাতর হইলে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে জীবিত মৎস্যের ঝোল খাইতে বলিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিলেন না,—তিনি বলিলেন, "আমি যাহা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ছাড়িয়াছি তাহা

না খাইলে যদি মৃত্যু হয় তাহাও ভাল, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ভগবানের নিকট দায়ী হইতে পারিবনা"।

আমিষভোজন ও প্রাণীহিংসা ত্যাগ করিতে তাঁহার যে সময় লাগিয়াছিল, কৌমার ব্রতাবলম্বনে তত সময় লাগে নাই। ভগবানের কৃপায় তিনি সে সুবিধা সহজেই লাভ করিয়াছিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার গ্রামে তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণের কথা প্রচারিত হইল। গ্রামের লোক প্রায় প্রত্যহই মামলা মোকর্দ্দমা তদ্বির করিবার জন্য ঢাকায় আসিত। তাহারা শুনিতে লাগিল, ভুবন মোহন ব্রাহ্ম সভা ও খ্রীষ্টানের গির্জ্জা প্রভৃতি বিধর্ম্মিগণের ধর্ম্মশালায় সতত যাতায়াত করেন। তাহারা সেই কথা নানারূপ রঞ্জিত করিয়া গ্রামে গিয়া গল্প করিত। কেহ বলিত, ভুবন মোহন ব্রাহ্ম হইয়াছেন; কেহ বলিত, তিনি খ্রীষ্টান হইয়াছেন। কেহ বলিত, তিনি বাঙ্গালী বিবি বিবাহ করিয়া ঢাকায় থাকিবেন; আবার কেহ বলিত, তিনি মেম বিবাহ করিয়া বিলাত যাইবেন। কেহ মিঃ এরাট্টুনের কন্যা ফিবির সহিত তাহার বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া দিত, কেহ বা পাদরী সাহেবের কন্যাকে তাঁহার ভাবী সহধর্ম্মিণী বলিয়া কল্পনা করিত। কেহ সাধু অঘোরনাথের কন্যা বা আত্মীয়ার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিত। এই সময় ভুবন মোহন বাটীতে গেলে সমবয়স্কগণ তাঁহাকে "ব্রহ্মদৈত্য" বলিয়া নানারূপ উপহাস করিত। ভুবন মোহন তাহাদের কথায় কোন উত্তর করিতেন না। কেবল ঈষৎ হাসিতেন এবং নির্ব্বিকার চিত্তে ভগবানের পাদ-পদ্ম ধ্যান করিতেন।

সে সময় অনেক উচ্ছৃঙ্খল-মতি যুবক, আহার-বিহারে অসংযত হইয়া ব্রাহ্ম সভাকেই আপনাদের খামখেয়ালির স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিল ব্রাহ্ম সভায় ধর্মের নামে অধর্মের প্রবল বন্যা বহিতেছিল। প্রাচ্যের শিক্ষা, দীক্ষা, সংযম, তিতীক্ষা ও ভক্তি তাহাতে তেমন ছিল না। তাহাতে ছিল কেবল পাশ্চাত্যের বিলাসিতা বিজড়িত সভ্যতার অনুকরণ। সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজে দুই চারিটি লোক ব্যতীত প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মহাত্মা পাওয়া দুষ্কর ছিল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাশব বৃত্তি সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানহীন বিলাসীর সংখ্যাই অধিক ছিল। এজন্য সাধারণ লোকে ইহাকে ঘৃণা করিত এবং উহা খ্রীষ্টান সমাজের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া মনে করিত। ভুবন মোহন এই বক-সমাজে হংস হইলেও সাধারণে তাঁহাকে বক বলিয়াই মনে করিত। বাল্যের সেই চঞ্চল বালক যে এত অল্প দিনেই ধর্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে,—বক মধ্যে যে হংস থাকিতে পারে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। তখন তাঁহার সম্বন্ধে গ্রামে বেশ একটুকু আন্দোলন চলিতে লাগিল। তাঁহাকে লইয়া সামাজিক আহারাদি করিতেও অনেকে অসম্মত হইল। কিন্তু কোন কিছুতেই ভুবন মোহনের লক্ষ্য নাই; তাঁহার লক্ষ্য কেবল সেই ভগবানের পাদপদ্মে। লোকের নানা কথায় তাঁহার জননী কিন্তু বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন।

ভুবন মোহন ছুটি পাইলেই বাড়ী আসেন, এবং বাড়ীতে আসিলে প্রাণপণে জননীর সেবা শুশ্রূষা করেন। একবার তিনি বাড়ী আসিয়া মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, এমন সময় মা বলিলেন, "তুই এখন আমাকে ভক্তি করিতেছিস্, খ্রীষ্টান মতে বিবাহ করিলে আর এ ভক্তি

থাকিবে না। তখন ত তোর ছোওয়া জলটুকুও খাওয়া যাইবে না,—না জানি আমার ভাগ্যে কত বিড়ম্বনাই আছে!" মায়ের এই কথায় তাঁহার কৌমার ব্রত গ্রহণের সুবর্ণ-যোগ উপস্থিত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ মায়ের চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন "মা! বিবাহ করিলে যদি তোমার প্রতি ভক্তির ব্যতিক্রম হয় মনে কর, তবে আমি এই তোমার পাদ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ জীবনে আর বিবাহ করিব না। আজ হইতে রমণী মাত্রই আমার মা। আজ হইতে সকল রমণীকেই তোমার মত দেখিব, সকলকেই 'মা' বলিয়া ডাকিব ও সকলকেই মা বলিয়া প্রণাম করিব।" পুত্রের মুখে এই কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া জননী একেবারে স্তম্ভিতা হইলেন, এবং বলিলেন, "ছিঃ! ছিঃ! তুই একি কথা বলিলি?" ভুবন মোহন আর কোন কথা কহিলেন না। ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হইল দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভক্তি ও আনন্দে পূর্ণ হইল, তাঁহার মুখ মণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কয়েক বৎসর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাদব চন্দ্র যখন বয়োপ্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার বিবাহের প্রতিবন্ধক ঘটিল, জ্যেষ্ঠ ভুবন মোহন বিবাহ করেন নাই;—তাঁহার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠ যাদব চন্দ্রের বিবাহ হইতে পারে না। তখন মাতা, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে বিবাহের জন্য কত অনুরোধ করিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কত বুঝাইলেন, কত শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিবাহে সম্মত করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ, আশা করি আপনারা আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আমি মাতৃ চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জীবনে বিবাহ করিব না। রমণী মাত্রেই

আমার জননী। আমি সেই অবধি অন্তরে জগতের যাবতীয় রমণীকে পূজা করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে সেই জননীকে কিরূপে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব? যদি রমণী ভিন্ন জগতে অন্য কোন জাতি থাকে, তবে আমি আপনাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি। অতএব আপনারা দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অনুমতি দিতেছি, যাদব বিবাহ করুক, আপনারা তাহা দেখিয়া সুখী হউন।” এই কথা শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন,—সরলতা, গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাহার বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে! তখন সকলেই অবাক্ হইয়া রহিলেন। অতঃপর তাঁহার অনুমতিক্রমে যাদব চন্দ্রের বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। ভুবন মোহন কৌমার ব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

ভুবন মোহন ধর্ম্মানুরাগী হইলেও তাঁহার শিক্ষানুরাগের হ্রাস হইল না। তিনি জানিতেন, জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের প্রশস্ত উপায়। সুতরাং ধর্ম্মানুরাগের সহিত তাঁহার শিক্ষানুরাগও প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে অন্যান্য গুণও প্রকটিত হইয়া উঠিল। পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায়, অতুলনীয় শিক্ষানুরাগ, দয়া, মেধা বুদ্ধি-প্রাখর্য্য, গাম্ভীর্য্য, শিক্ষাদান-প্রণালী, সত্য-নিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা ও ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, “ভুবনে যাহা আছে, ভুবনে তাহা আছে।” স্কুলে তিনি পূর্ব্বাপরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার সরলতা ও অমায়িকতায় ছাত্রগণ তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিল। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রগণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, বয়ঃ কনিষ্ঠগণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করি-

তেন এবং সম-বয়স্কগণকে বন্ধুর ন্যায় ভাল বাসিতেন। অন্যান্য শিক্ষক গণও তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তাঁহাদের প্রশংসাবাদে ভুবন মোহন গর্ব্বিত হইয়া পাঠাভ্যাসে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন নাই; বরং তাহাতে উত্তরোত্তর তাঁহার উৎসাহ সমধিক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য কঠোর হইতে কঠোরতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। অতঃপর কয়েকমাস পরে তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গেল। এই পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন।

নবম অধ্যায়

তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কয়েকদিন পর ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে একটী শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। অধ্যক্ষ মিঃ এরাটুন্ নর্ম্মাল পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রগণের কাহাকেও ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। ভুবন মোহন প্রমুখ সাতজন ছাত্র ঐ পদের জন্য দরখাস্ত করিলেন। সাহেব, প্রধান শিক্ষক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত চাহিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভুবন মোহনের গুণাবলি উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্তের পৃষ্ঠে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এই সংবাদে অপর প্রার্থিগণ নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া

পড়িল। সকলেই মনে করিল এই পদ ভুবন মোহনই পাইবেন। তিনি নর্ম্মাল স্কুলের পূর্ণচন্দ্র,এবার পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তিনিই ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, তারপর প্রধান শিক্ষক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তীব্র অনুকূল মন্তব্য। এতদ্ব্যতীত তিনি অধ্যক্ষ কন্যা মিস্ ফিবির পূর্ব্বতন শিক্ষক।

এই সকল চিন্তা করিয়া অপর প্রার্থিগণ যেমন ভগ্নোৎসাহ হইতে লাগিল, আবার ছাত্র বিদ্রোহের সময় মিঃ এরাটুন ভুবন মোহনকে যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আশার ক্ষীণালোক বিদ্যুৎচমকের ন্যায় ক্ষণেকের জন্য কখনও কখনও তাহাদের হৃদয়ে দেখা দিতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তীব্র মন্তব্য, সাহেব সেই সামান্য কারণে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না মনে করিয়া নিরাশার অন্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

বিজ্ঞাপনের নির্দ্ধারিত দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বেই ছয় জন প্রার্থী গিয়া নর্ম্মাল স্কুলের বারান্দায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। আজ সাহেব প্রার্থী দিগকে দেখিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। কাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে তাহা অনিশ্চিত। সকলেই সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান। তখনও অধ্যক্ষ সাহেব স্কুলে আইসেন নাই। প্রার্থিগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিতেছে। দূরে একজন পাগড়ী বান্ধা দপ্তরী বা চাপরাসীকে ঐ পথে দেখিলেই তাহারা তাহাকে সাহেব ভ্রমে স্বীয় পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সকলের মুখে সেই এক নিরাশ বাক্য, কেবল একমাত্র ভরসা সাহেবের সেই ছাত্র বিপ্লবের সময়ের কথা। এমন সময় ভুবন মোহন তাঁহাদের

সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "এ কাজ তুমিই পাইবে,—আমাদের আইসা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।" ভুবন মোহন কহিলেন, "আমিই পাইব তাহা কে, বলিবে? আপনাদের অপেক্ষা আমি অধিকতর গুণবান্ নহি।" এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় ঘড়িতে এগারটা বাজিতে লাগিল, অধ্যক্ষ সাহেব আসিয়া স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রার্থিগণ এক দৃষ্টে সেই কক্ষের দিকে তাকাইয়া রহিল, এবং প্রতি নিমিষে চাপরাসীর ডাক অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় আধঘণ্টা অতীত হইলে একজনের ডাক পড়িল। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া একটি মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে ছিলেন, ডাক শুনিয়া দুর্গানাম জপিতে জপিতে সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। সাহেব আর কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই, একবার তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, "বয়স কত? এখন কি কর?" এই দুইটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই অমানুষিক সাহেবী প্রতিভা-বলে তাহাকে অযোগ্য সাব্যস্ত করিয়া বিদায় দিলেন। প্রার্থী নিরাশ মনে শুষ্ক মুখে কক্ষ হইতে বহির্গত হইল,—অমনি ভুবন মোহনের ডাক পড়িল। ভুবন মোহন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়-মান হইলে, সাহেব বলিলেন, "তুমি এই বিদ্যালয়ের একজন ভাল ছাত্র এবার তুমি তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছ, প্রধান শিক্ষক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তোমাকে নিযুক্ত করার জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল কারণে এই পদে তোমার দাবী সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক হইলেও তুমি ইতঃপূর্ব্বে ছাত্র বিদ্রোহের নেতা হইয়াছিলে এবং তুমি আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে, এনিমিত্ত আমি অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমি তোমাকে এই পদে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করিলাম না।" ভুবন মোহন সাহেবের ভ্রম ধারণা অপনোদন জন্য দুই একটি কথা বলিতে চাহিলেন, সাহেব তাহা শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি নিরাশ-ব্যঞ্জক মলিন বদনে বাহিরে আসিলেন। কক্ষমধ্যে তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অপর প্রার্থিগণ মনে করিতেছিল নিশ্চয়ই ভুবন মোহনের চাকুরী হইল, এক্ষণে তাঁহাকে ম্লান বদনে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাহাদের সে ভাবনা দূরীভূত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তির ডাক পড়িল। প্রার্থী কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিবা মাত্র সাহেব তাহাকে চিনিলেন এবং সহাস্য বদনে কহিলেন, "বেশ, ছাত্র বিদ্রোহে তুমি বাইবেল স্পর্শ করিয়া আমার নিকট যে ধর্ম্মানুরাগ ও সত্যবাদিতার প্রমাণ দিয়াছিলে আজ তাহার পুরস্কার স্বরূপ এবং ধর্ম্ম ও সত্যের সম্মান প্রদর্শন জন্য এই পদে তোমাকে অতীব আনন্দের সহিত নিযুক্ত করিলাম। আশা করি তুমি ছাত্রগণকে ধর্ম্ম ও সত্যপথে চালিত করিয়া এই পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। তুমি এক্ষণে বাহিরে অপেক্ষা কর অদ্যই নিযুক্তি-পত্র পাইবে।" প্রার্থী, "আপনি ধর্ম্মাবতার, সত্যের প্রতিমূর্ত্তি, নিঃসহায়ের সহায়, এবং দরিদ্রের পিতা মাতা," এই বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক সাহেবকে পুনরায় অভিবাদন করিয়া স্মিত মুখে বাহিরে আসিলেন; তাহার প্রফুল্ল বদন দেখিয়াই সকলে মনে করিল তাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গেই চাপরাসী আসিয়া, তাহাকে

ব্যতীত অন্যান্য প্রার্থীদিগকে সাহেব চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন, প্রকাশ করিল। তাহারা ভগ্ন মনে গৃহাভিমুখী হইয়াছে, এমন সময় বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভুবন মোহনকে ডাকাইলেন। তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "ভুবন! দুঃখিত হইও না। ইহা যুগধর্ম্ম। এযুগে ধর্ম্মই অধর্ম্ম, আর অধর্ম্মই ধর্ম্ম। সত্যই মিথ্যা, আর মিথ্যাই সত্য। তার পর আবার আমাদের বিচার! সরলতা ও স্পষ্টবাদিতা আমাদের পরম শত্রু;—কপটতা ও কৌটিল্যই আমাদের আদরের সামগ্রী। সুতরাং এপদে তুমি নিযুক্ত না হওয়ায় আমি বিস্মিত হই নাই। বিশেষতঃ যাহার নিকট সত্যের সম্মান নাই,—গুণের আদর নাই, তাহার অধীনে চাকুরী করিয়া তোমার মনুষ্যত্ব লোপ করা বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত নয় বলিয়াই তুমি এপদে বঞ্চিত হইয়াছ। যাও, এখন বাড়ী যাও। ভগবান্, তোমার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ সুশীল কৃতী পুরুষের অবশ্যই মঙ্গল করিবেন।"

ভুবন মোহন, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মিরপুর মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স একবিংশ বৎসর মাত্র। তাঁহার নবীন বয়স দেখিয়া গ্রামবাসিগণ প্রথমে নানারূপ আশঙ্কাই করিয়াছিল, কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তাঁহার অসীম ধর্ম্মানুরাগ, দয়াদাক্ষিণ্য, বিনয়, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা, সচ্চরিত্রতা, অধ্যপনা-নৈপুণ্য ও মধুর বাক্যে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিল। তিনি ছাত্রগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ

করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণও তাঁহার স্নেহ-মধুরবাক্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিল।

মিরপুর গ্রামখানি বড়ই অস্বাস্থ্যকর। ছাত্র ও প্রতিবেশিগণ প্রায়ই জ্বরাদি পীড়ায় অনেক সময় কষ্ট পাইত। পণ্ডিত ভুবন মোহন কাহারও কোন পীড়ার সংবাদ পাইলে অমনি তথায় গিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন। এজন্য গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। এইরূপে পাঁচ বৎসর তথায় থাকার পর দুরন্ত ম্যালেরিয়া তাঁহাকে এরূপ আক্রমণ করিল যে তিনি আর তথায় টিকিতে পারিলেন না,—প্রাণ-সংশয় কাতর হইয়া বাটিতে আসিলেন; এবং দীর্ঘকাল কাতর থাকায় চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

দশম অধ্যায়।

প্রায় এক বৎসর চিকিৎসিত হইবার পর ভুবন মোহন সুস্থ হইয়া পুনরায় চাকুরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দুই এক স্থানে খোঁজও পাইলেন, কিন্তু স্থান স্বাস্থ্যকর নয় বলিয়া তাহার জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না। কিছু দিন পরে পাবনা জেলার সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত পোর্জ্জনা মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে জানিতে পারিলেন। শুনিলেন, স্থানটি স্বাস্থ্যকর ও তথায় বিস্তর ভদ্রলোকের বাস। তিনি ঐ কার্য্যের জন্য দরখাস্ত করিলেন। অনতি

বিলম্বেই তথা হইতে তাঁহার নিযুক্তিপত্র আসিল, তিনি অগৌণে পোর্জ্জনা গিয়া কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলেন।

স্থানীয় জমিদার মুকুন্দ চন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের যত্নেই স্কুলটি চলিতেছিল। তিনি ভুবন মোহনের হস্তে নিজ পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিজ বাড়ীতেই তাঁহার বাসা দিলেন এবং নিজেই তাঁহার আহারের ভার গ্রহণ করিলেন।

পণ্ডিত ভুবন মোহন স্কুলে কাজ করেন, আর দুইবেলা ছেলে দুইটিকে পড়ান, আর অবকাশ পাইলেই হয় কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়েন, না হয় ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হন। জমিদার মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর কোন স্থানে তাস, দাবা বা পাশা চলিতেছে, কোথাও বা কত গল্প গুজব হইতেছে, তাহাতে কত আদিরসের ছড়াছড়ি হইতেছে, কোথাও বা সন্ধ্যার পর ভাদুড়ী মহাশয়ের অজ্ঞাতে কেহ মদ খাইয়া গড়াগড়ি দিতেছে। ভুবন মোহন ইহাদের কোন দলেই মিশিতেন না, তিনি আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতেন, আর ভগবচ্চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। এ জন্য ঐ সম্প্রদায়ের লোকের নিকট তিনি নিতান্ত অসামাজিক ও অরসিক বলিয়া গণ্য হইলেন। তাহারা তাঁহাকে কেহ বৈরাগী, কেহ বা তাঁহাকে ব্রাহ্ম জানিয়া 'ব্রহ্মদৈত্য' বলিয়া উপহাস করিত। কেহ কেহ বলিত, "পণ্ডিত আবার ব্রাহ্ম কিসের? মাছ মাংস খায় না, মদ খায় না, সে আবার ব্রাহ্ম?" ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম-প্রধান পোর্জ্জনার মুকুন্দ বাবু প্রমুখ ভদ্রমণ্ডলী প্রথমে যখন শুনিয়াছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় ব্রাহ্ম, তখন তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে একটুকু অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, পরে যখন

তাঁহারা দেখিলেন, পণ্ডিত মহাশয় হিন্দুর অখাদ্য দূরে থাকুক, মৎস্য-মাংস পর্য্যন্ত খান না, তিনি ব্রহ্মচারীর ন্যায় কৌমার ব্রতাবলম্বী, তাঁহার হৃদয় স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, সরল, পর-দুঃখ-কাতর ও ভগবৎপ্রেমে ডগমগ, তখন সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী যেরূপ প্রীত হইলেন, ছাত্রগণও সেইরূপ তাঁহার স্নেহ-মধুর বচনে তাঁহার অনুরক্ত হইল।

অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার প্রতি ভুবন মোহনের বিশেষ অনুরাগ ছিল, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি পোর্জ্জনায় আসিবার কিছুদিন পর জানিতে পারিলেন, পোর্জ্জনার প্রায় চারি মাইল দূরে ভুতরিয়া গ্রামে রাজীবলোচন তর্কপঞ্চানন নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আছেন; তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র পড়ে। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট পুনরায় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী সমাপ্ত করিয়া উপাধি পরীক্ষা দিলেন এবং তাহাতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যারত্ন উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজ নামের সহিত ঐ উপাধি যোগ করেন নাই। পারিবারিক আত্মীয়গণ মধ্যেও তাঁহার এই উপাধির কথা অনেকে জানিতে পারেন নাই। তিনি আত্মগৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া আত্মগোপনের চেষ্টাই অধিকতর করিতেন। কেহ তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন, "আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের জীবনী লিখিয়া কি হইবে?" তিনি বাস্তবিকই আপনাকে তৃণাদপি ক্ষুদ্র মনে করিতেন। ছোট বড়

সকলকেই অগ্রে নমস্কার করিয়া বসিতেন। আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও তাঁহাকে অনেক সময় অগ্রে নমস্কার করিতে পারি নাই।

তাঁহার জ্ঞান-পিপাসার কিছুতেই নিবৃত্তি হইত না। মাসান্তে বেতন পাইলে জননী ও বিধবা ভ্রাতৃবধূর জন্য বাড়ীতে কিছু পাঠাইতেন, তৎপর দীন-দুঃখীর সাহায্য করিয়া যাহাকিছু থাকিত তদ্দ্বারা গীতা, উপনিষদ ও সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থআনাইয়া পাঠকরিতেন।

আরবী ও উর্দ্দু শিক্ষা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে যে কোন ধর্ম্মালোচনাই হউক না কেন, ভুবন মোহন তাহার সংবাদ পাইলেই, মধুলোলুপ ভৃঙ্গের ন্যায় জ্ঞানামৃত লাভের আশায় তথায় ছুটিতেন। তিনি কোন ধর্ম্মকেই অশ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি জানিতেন, সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই ভগবানের আরাধনা, কেবল সম্প্রদায় ভেদে উপাসনার প্রণালী ভেদ মাত্র। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন একজন পশ্চিম দেশীয় মৌলবী পোর্জ্জনার নিকটবর্ত্তী গ্রামে আসিয়াছেন, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কোরাণ সরিপ পাঠ করিবেন। চারিদিক হইতে মুসলমানগণ তাহা শুনিতে ছুটিল, তিনিও তাহাদের সঙ্গী হইলেন। কোরাণ আরবী গ্রন্থ, মৌলবী সাহেব তাহা ব্যাখ্যা করিলেন উর্দ্দুতে। ভুবন মোহন আরবী জানিতেন না, উর্দ্দুতেও তাঁহার তেমন অধিকার ছিল না। সুতরাং কোরাণ ব্যাখ্যা তেমন ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার আরবী ও উর্দ্দু শিখিবার বাসনা বলবতী হইল। তিনি অনেক

মৌলবীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার শিক্ষারভার গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে একজন সদাশয় বৃদ্ধ মৌলবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মৌলবী কহিলেন, "দিনে আপনি ও আমি উভয়েই অনবসর, রাত্রেও আমার অবসর নাই। সন্ধ্যা লাগিলেই আমাকে গিয়া বাঙ্গী ক্ষেত পাহারা দিতে হয়, নহিলে শূকরের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গী থাকে না। তবে আপনি যদি সন্ধ্যার পর সেইখানে আসিতে পারেন তবে আমি আপনাকে যথাসাধ্য শিখাইতে পারিব।" তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ক্ষেতে গিয়া উপস্থিত হইতেন। দলে দলে বন্য শূকর আসিয়া ক্ষেতে উপদ্রব করিত, তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া মৌলবীর সাহায্য করিতেন। যে টুকু সময় পাইতেন তাহার মধ্যে তিনি আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু শিখিতে লাগিলেন। মৌলবীও তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও মেধাবলে তিনি অল্পদিন মধ্যেই উক্ত তিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি মৌলবীর নিকট সমগ্র কোরাণ খানি পাঠ করিয়া প্রাণের আশা মিটাইলেন। কোরাণে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। অনেক বড় বড় মৌলবী তাহার মুখে কোরাণের ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

মহর্ষি মিলন।

পোর্জ্জনার অনতিদূরে সহাজাদপুর গ্রাম। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রামের জমিদার। সেখানে তাঁহার একটি কাছারীও আছে। একবার মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে মহর্ষি সে

কাছারীতে আসিয়াছেন,—তাঁহার শুভাগমন সংবাদ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে,—দলে দলে প্রজাগণ তাঁহার নিকট গিয়া আপনাদের অভাব-অভিযোগ জানাইতেছে,—কত লোক নিষ্পাপ হইবার আশায় তাঁহাকে গিয়া দর্শন করিতেছে। এই সকল লোকের মুখে পণ্ডিত ভুবন মোহনের ধর্ম্মানুরাগ ও সহৃদয়তার কথা মহর্ষির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

১১ই মাঘ মাঘোৎসব, সুতরাং দিন নিকটবর্ত্তী; মহর্ষি এই উৎসব এবার সাহাজাদপুর কাছারীতেই সম্পন্ন করিবেন,—আর কলিকাতায় যাইবেন না,—স্থির করিলেন। তাঁহার আদেশে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। নায়েব, আমলা, বরকন্দাজ কাহারও এক মুহূর্ত্তেরও বিশ্রাম নাই,—দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া সভামণ্ডপ, উপাসনার বেদিকা, কাছারীর সংস্কার, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক গণের বাসস্থান নির্ম্মাণ ও দরিদ্র-ভোজনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে মহর্ষি, পণ্ডিত ভুবন মোহনকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

মহর্ষির সাহাজাদপুরে আগমন সংবাদ ভুবন মোহন পূর্ব্বেই জানিয়া ছিলেন। তিনি অনেকদিন হইতেই মহর্ষির গুণগ্রাম শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার সাহাজাদপুরে আগমন সংবাদ জানিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অভিলাষী হন; কিন্তু তাঁহার সে বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তারপর তাঁহার আর একটি কথাও মনে উদিত হইয়াছিল, তিনি মনে করিয়াছিলেন, মহর্ষি একজন দেশ-প্রসিদ্ধ জমিদার: তিনি এখানে জমিদারী শাসন করিতে আসিয়াছেন, এখানে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া প্রাণের আশা মিটিবে কি? এইরূপ

চিন্তা করিয়া একটুকু ইতস্ততঃও করিতে ছিলেন। আজ মহর্ষির নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া তাঁহার সে সকল চিন্তা দূরীভূত হইল,—তাহার হৃদয়ে অপার আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে সেই শুভদিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পর দিনই সেই ১১ই মাঘ। ভুবন মোহনের এ বিলম্ব টুকুও যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই সাহাজাদপুর রওনা হইলেন। কাছারীতে পৌঁছিয়া দেখিলেন, কাছারীখানি কদলী বৃক্ষে ও নানা পুষ্প-পতাকায় সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। সভামণ্ডপ নানা কারুকার্য্যে সুশোভিত হইয়াছে। নানা পুষ্প পত্রে শোভিত সুরম্য বেদিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বৃহস্পতির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার প্রশান্ত ও প্রসন্ন বদনে অনুপম ব্রহ্মজ্যোতিঃ যেন প্রতিভাত হইয়া দর্শকগণের ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। বিস্তর উপাসক ও দর্শক উপস্থিত হইয়াছেন, সুমধুর কীর্ত্তন চলিতেছে। এমন সময় গিয়া ভুবন মোহন উৎসবে যোগদান করিলেন। অহোরাত্র ব্যাপিয়া উৎসব চলিল। মহর্ষি ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে কখন বা ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কখন বা ব্রহ্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, আবার কখন বা হৃদয়ের আবেগে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। উপাসনান্তে একটি সঙ্গীত হইল। মহর্ষি বেদিকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রত্যেকের সহিত আলিঙ্গন ও প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন। অতঃপর ভুবন মোহনের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। উভয়ে ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া কত আলাপ করিলেন, যেন কত দিনের পরিচিত, —কত দিনের বন্ধুতা। মহর্ষি তাঁহার অসীম ধর্ম্মানুরাগ ও ভগবৎপ্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে ভূয়সী প্রসংসা করিতে লাগিলেন।

উৎসবের পরদিন কাঙ্গালী-ভোজনের আয়োজন হইল। সহস্র সহস্র কাঙ্গালী কাছারী প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। মহর্ষি নিজে তাহাদের আহারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। কাঙ্গালিগণ সুবৃহৎ প্রাঙ্গনে সারি ধরিয়া বসিল, তাহা দেখিয়া মহর্ষির দুই চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, "আজ আমার এতগুলি কাঙ্গাল ভ্রাতা এখানে বসিয়া খাইবে, আর আমি পৃথক খাইব, তাহা হইবে না। আমি ইহাদের সঙ্গেই বসিব।" এই বলিয়া তিনিও তাহাদের সঙ্গে পাতা লইয়া বসিয়া গেলেন। নায়েব, আমলা ও দর্শকগণ তাহা দেখিয়া অবাক্ হইল। তাহারা ভাবিল ইনি কি মানুষ, না দেবতা? এমন উদার প্রেম কি মানুষে সম্ভবে? ভুবন মোহনও মহর্ষির এই দেব-ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ দীন-বাৎসল্যও সমপ্রাণতার ভাব তিনি জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। সেই অবধি তাঁহার হৃদয়ে মহর্ষির এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত অঙ্কিত হইয়া রহিল, তিনি সততই তাঁহার অনুসরণ করিতেন। তিনি বলিতেন, আত্মাভিমান বিদূরিত হইয়া সর্ব্ব-জীবে সমভাব ও প্রকৃত দৈন্য বা অমানিতা না আসিলে ব্রহ্ম পথের পথিক হওয়া যায় না। অতঃপর এই ভাব, তাঁহার জীবনেও প্রতি-ফলিত হইয়াছিল। তাই তাঁহাকেও লোকে মহর্ষি বলিয়া ভক্তি করিত।

কাঙ্গালী ভোজনের পর ভুবন মোহন মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় লইয়া পোর্জ্জনায় ফিরিয়া আসিলেন, উভয়ে পরস্পর চক্ষের অন্তরালে অবস্থিত হইলেও, অনুরাগের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। কিছুদিন পর

মহর্ষি সাহাজাদপুর হইতে যাইবার সময়, আবার ভুবন মোহনকে সংবাদ দিলেন,—ভুবন মোহন আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,—আবার উভয়ে প্রেম-তরঙ্গে ডুবিলেন। অবশেষে মহর্ষি তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার মত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-বিশ্বাসী প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়া এখানে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলাম ; তুমি কলিকাতায় গেলে আমার সহিত দেখা করিতে ভুলিও না।" এই বলিয়া মহর্ষি সাহাজাদপুর হইতে রওনা হইলেন, ভুবন মোহন পোর্জ্জনায় প্রত্যাগত হইলেন।

অতঃপর দিনাজপুর থাকা কালে একবার তিনি কলিকাতায় গিয়া মহর্ষির দর্শনলাভার্থে, তাঁহার বাটীতে গেলেন। বাহিরে একজন ভদ্রলোককে পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। ভদ্রলোকটি মহর্ষির সম্পর্কিত। তিনি বাললেন, "মহর্ষির শরীর অসুস্থ, ডাক্তারেরা তাঁহাকে অন্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ভুবন মোহন ভগ্ন মনে ঐ স্থানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এতদূর আসিয়াও পুণ্যাত্মা মহর্ষির সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হইলাম, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?" এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য সেখানে আসিল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষি কেমন আছেন?" ভৃত্য বলিল, "তাঁহার খুব অসুখ হইয়াছিল এখন একটুকু ভাল আছেন,—কোথাও বাহির হন না।" তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আমার একখানি খুব দরকারী পত্র তুমি মহর্ষিকে দিতে পারিবে?"

সে তাহাতে সম্মত হইলে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিলেন। সে পত্র লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। একটুকু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহর্ষি আপনাকে ডাকিয়াছেন। আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন।" তিনি ভিতরে গিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করিবামাত্র মহর্ষি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ভুবন আজ তোমার সাধু জীবনের পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া আমার বহুকালের প্রাণের জ্বালা বিদূরিত হইল।" উভয়ে প্রেমাশ্রুতে পরিপ্লুত হইলেন। অবশেষে নানা কথা বার্ত্তার পর ভুবন মোহন মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

সেবাব্রত ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

পূর্ব্বে ছাত্র বা প্রতিবেশিগণ মধ্যে কেহ পীড়িত হইলেই পণ্ডিত ভুবন মোহন গিয়া শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে তাঁহার সেই সেবা ব্রত সম্প্রসারিত হইল। তিনি, যে কাহারই পীড়ার সংবাদ পাইতে লাগিলেন, অমনি তথায় গিয়া শুশ্রূষার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তাহাতেও তাঁহার মনের তৃপ্তি হইল না। তিনি দেখিলেন, শুধু শুশ্রূষায় মানুষের জীবন রক্ষা করা যায় না;—জীবন রক্ষা করিতে হইলে চিকিৎসার প্রয়োজন; কিন্তু অনেক দরিদ্র অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারে না, তাই তিনি তাহাদের চিকিৎ-সার ব্যবস্থা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন, একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ই দরিদ্রের উপযোগী। তখন তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার একখানা বাঙ্গালা বহি ও কিছু

ঔষধ আনাইলেন। প্রথমে কয়েকটি সামান্য রোগীকে ঔষধ দিয়া বেশ ফল পাইলেন,—তাহাতে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। তিনি আরও মনোযোগ সহকারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন এবং পরম উৎসাহে দরিদ্রগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বিনাব্যয়ে সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা পাইয়া সর্ব্ব সাধারণে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। তাঁহার সুচিকিৎসার প্রশংসা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। গ্রামান্তর হইতেও লোক তাঁহার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিতে লাগিল। তাঁহার আর অবসর রহিল না, প্রাতে ও স্কুলের পর রোগী-সেবায়ই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অগ্নি পরীক্ষা

পণ্ডিত ভুবন মোহন, যুবক, হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ, মধুর-কান্তি ও মধুর-ভাষী, আজ পর্য্যন্তও তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি জীবনে কখনও বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পোর্জ্জনার ভাদুড়ী মহাশয় প্রভৃতি প্রবীণগণ তাঁহার কার্য্যকলাপ ও সংস্বভাবে তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে সকল নীচাশয় দুষ্ক্রিয়াসক্ত যুবকের সহিত তিনি মিশিতেন না, তাহারা তাঁহাকে বিষনেত্রে দেখিতে লাগিল। তিনি আরবী পার্শী শিক্ষার জন্য রাত্রে মৌলবীর বাড়ী ক্ষেতে পাহারা দিতেন; তাঁহার সেই অনুপস্থিতিতে নানা অলঙ্কার দিয়া তাহারা নানা কুৎসা গাহিত, কিন্তু নিষ্পাপ ভুবন মোহন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

তিনি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য দার গ্রহণে অসম্মত থাকিলেও স্ত্রীজাতীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বলিতেন, "ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা তখনই হয় যখন রমণীতে জননীত্ব জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

মহাজনগণ বলিয়াছেন :—

"দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক্ পলক্ লহু চোষে,
দুনিয়া সব্ বাউরি হোকে ঐসা বাঘিনী ঘর ঘর পোষে।"

নারীর মোহজাল হইতে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের আত্মরক্ষার উপায় দুষ্কর বলিয়া মহাজনগণ বলিয়াছেন, কামিণী মোহিনীরূপে দিনে, ও বাঘিনীরূপে রাত্রে শোণিত শোষণ করে। তথাপি পৃথিবীর লোক এমনই বাতুল, যে জানিয়া শুনিয়া এই বাঘিনীরূপিণী কামিনী পুষিয়া থাকে।' রমণীর মোহাকর্ষণ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রমণীকে জননীত্বে প্রতিষ্ঠা করা। তাহা করিতে না পারিলে যোগী হউন, তপস্বী হউন, বা নির্জ্জন গিরি-গহ্বর-বাসীই হউন, পতন হইতে আত্মরক্ষা, বা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা দুষ্কর হইয়া পড়িবে। অনেকে বলেন স্ত্রীমুখ-দর্শন মহাপাপ, কিন্তু সেটা ভুল। স্ত্রীজাতি ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি। তাঁহার করুণাই মূর্ত্তিমতী মাতারূপে অবতীর্ণা হইয়া জগৎপালন করিতেছেন। কীটানুকীট হইতে মানব পর্য্যন্ত, সকল মাতৃ হৃদয়েই একই করুণার স্রোত প্রবাহিত হইয়া জগতের সন্তাপ হরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয় স্ববশে থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কামিণীর এমনই আকর্ষণ শক্তি যে, দর্শন মাত্র মনের বিকার ঘটাইতে পারে। তাই ভক্ত তুলসী

দাস সংসার-দুঃখ-দায়িনী ও ভক্তি পথের কণ্টক-রূপিণী কামিনীর দর্শন, ষড়্‌রিপু অপেক্ষা প্রবল বলিয়াছেন ;—

"কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহকে ধারি,
তিন মহঁ অতি দারুণ দুঃখ মায়ারূপী নারী।"

'প্রবল মোহ বল, কাম ক্রোধ লোভাদি মদ রিপুগণই বল, সর্ব্বাপেক্ষা মায়ারূপিণী কামিণীগণই নিদারুণ দুঃখদায়িনী।'

মহাত্মা সাধক কবিরাও বলিয়াছেন ;—

'নারী সংস্মৃতি মূলিকা অর্গলস্থর পুরকের,
চিত্রমপি নাই দেখাই বুদ্ধি মস্ত মনের।'

'স্ত্রীলোকগণই সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ এবং স্বর্গ-পথের অবরোধকারিণী। এই জন্য বুদ্ধিমানগণ স্ত্রীলোকের চিত্রও দর্শন করেন না। কেননা তাহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে।'

চৈতন্যদেব, ছোট হরিদাসকে বলিয়াছিলেন ;—

"কাষ্ঠের রমণী দেখি কামের বিকাশ,
কেমনে রাখিবে চিত্ত রমণীর পাশ ?"

সুতরাং যাহাদের মন বশীভূত হয় নাই, হৃদয়ে পবিত্র ধর্ম্ম-ভাব জাগে নাই,—যাহারা ষড়্‌রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে নাই, তাহাদের মন-ভৃঙ্গ অনল-রূপিণী কামিনীতে ঝম্প প্রদান করিয়া দগ্ধীভূত হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করে। সে দোষ অনল-রূপিণী কামিনীর নহে,—পতঙ্গরূপী মানবেরই বলিতে হইবে। মনে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইলে, আর দাহন ভয় থাকিবে না। মঙ্গলময় বিধাতা সর্ব্ব দোষের নিলয় করিয়া রমণী সৃষ্টি করেন নাই। রমণী

পবিত্র স্নেহের নির্ঝরিণী, সংসার-তাপানল-দগ্ধ জীবের শান্তিদায়িণী। এক মুহূর্ত্ত এই মাতৃ জাতির অভাব হইলে, এই সুখের সংসার ভীষণ মরুময় শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হয়। বিধাতার করুণাই মূর্ত্তিমতী প্রীতিরূপে রমণীতে অধিষ্ঠান করিতেছে। নারীতে যে মোহের আকর্ষণ আছে, তাহা সেই প্রীতিরই আকর্ষণ। পবিত্র প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে, প্রীতির চক্ষে তাহাকে না দেখিতে পারিলেই পাপের সঞ্চার হয়, এবং পাপ হইতেই পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এমন পবিত্র স্নেহের মূর্ত্তির প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা বা দোষারোপ করা কখনই বিধেয় নহে। যাহাতে বিধাতার প্রেমময়ী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার নিন্দা বা অবমাননা করিলে প্রকারান্তরে বিধাতারই নিন্দা করা হয়। রমণীত্বে, জননীত্ব স্থাপন করিয়া, তাহাকে প্রীতির নেত্রে জননী ভাবে দেখিলে এবং জননী বলিয়া ডাকিতে পারিলেই, মোহ-পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

যখন রমণী দর্শনেই জননী-ভাব জাগিয়া উঠিবে তখনই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইবে;—হৃদয় পবিত্র প্রীতির আলোকে পুলকিত হইবে। তখনই দেখিবে বিধাতার একই করুণা বাহিরে মাতৃরূপিণী নারী মূর্ত্তিতে এবং অন্তরে আনন্দময়ী প্রীতি বা ভক্তি রূপে বিরাজ করিতেছে। হৃদয়ের প্রীতি, এই প্রীতি রূপিণী মাতৃ মূর্ত্তিতে ঢালিয়া, যিনি জগজ্জননীর আরাধনা করিতে পারেন, তাঁহারই জীবন ধন্য, তাঁহারই আরাধনা সার্থক। আর্য্য শাস্ত্রে পশু বলিদান মাতৃ পূজায় বিধান আছে। সেই বলিদান, হিংসামূলক প্রাণী-হনন নহে ; কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মদ, মাৎসর্য্যাদি অজ্ঞানমূলক অহঙ্কাররূপ পশু ভাবের বলিদান করাই

প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই কামাদি জঘন্য বৃত্তিরূপ পশুত্বের বলিদান না করিতে পারিলে, মাতৃপূজার অধিকারী হওয়া যায় না; মহাশক্তির পূজা করিয়াও শক্তি লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। যতদিন আর্য্য-সমাজে পশুভাব বলিদান করিয়া শক্তি পূজার বিধান ছিল, ততদিন যাগ-যজ্ঞাদিতে সর্ব্বত্র এই মাতৃজাতির সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনা হইত। যতদিন এই মাতৃজাতির পূজা প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন ভারতে আর্য্য-শক্তিও অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত ছিল, মাতৃজাতির অবমানাই জাতীয় পতনের অন্যতম কারণ। সীতার অবমাননায় রাক্ষসকুল, দ্রৌপদীর অবমাননায় কুরুকুল এবং হেলেনার অবমাননায় সুরক্ষিতা ট্রয় নগরীর পতনই ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। আমার বিশ্বাস মাতৃজাতির প্রতি সম্মান আছে বলিয়া পাশ্চাত্য জাতি জগতে এত উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি মাতৃজাতির উন্নতিতে জগতের শ্রী ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ, এই নারী-জাতিকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর নীচাশয়গণের আড্ডায় ভুবন মোহনের উল্লিখিত কথার সমালোচনা আরম্ভ হইল। একজন বলিল, "পণ্ডিত তবে কি বাস্তবিকই সাধু?" অন্য একজন বলিল, "মুখে অমন সাধু অনেকেই হইতে পারে, কাজে হয় তবে ত!" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "পণ্ডিত যদি অত সাধু তবে রাত্রে ঘরে থাকে না কেন?"

প্রঃ ব্যঃ। সে নাকি আগে আরবী পার্শি পড়্‌তে যেত?

দ্বিঃ ব্যঃ। পড়ে কি সারা রাত? আমি যে একদিন শেষ রাত্রে চুপি চুপি ফিরে আস্‌তে দেখেছি।

৬

তৃতীঃ ব্যঃ। আরে ডুব দিয়া জল খেলে একাদশীর বাবাও জানেনা। আমাদের মুকুন্দ বাবু হচ্ছেন সোজা লোক। পণ্ডিত ভয়ানক চালাক, তাই সে ঐরূপ দুই চারটি বোল চাল দিয়ে তাকে ভুলিয়ে ফেলেছে।

প্রঃ ব্যঃ। রমণী মাত্রে মা,—এর উপর আর কথা কি?

দ্বিঃ ব্যঃ। আরে দাদা! এ কথাটা বুঝলে না? ঐটিই ত চাল। ও যে ব্রাহ্ম! ব্রাহ্মদের এতদিন সকল স্ত্রীলোকই ভগিনী ছিল। ইনি এখন 'ভগিনী' পালটিয়া 'মা' বুলি ধরেছেন। আচ্ছা, সে যে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলে তাহারা বৃদ্ধা। কোনও যুবতীকে মা বলিয়া ডাকৃতে দেখেছ কি?

তখন সকলেই বলিল, "না, তাত দেখি নাই।" বাস্তবিক পক্ষে কখনও কোন যুবতীর সহিত ভুবন মোহনের কথা বলিবার কোন কারণ কোথাও ঘটে নাই।

তৃতীয় ব্যঃ। আজকাল পণ্ডিত আবার আর এক ঢং ধরেছে। এক ঔষধের বাকৃস করেছে, তাই নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঔষধ বিতরণ করে। পণ্ডিত মানুষ, বাড়ীর অবস্থাও তেমন ভাল নয়। তার আবার ঔষধ বিতরণ কেন?

প্রঃ ব্যঃ। হাঁ, তাও একটা কথা বটে! তা' যাক্, না হয় প্রথম প্রথম শিক্ষার সময় দুই এক ফোঁটা ঔষধ দিলেই বা। কিন্তু যেচে বাড়ী বাড়ী গিয়া চিকিৎসা করা কেন? আর চিকিৎসাই বা কর্‌লে, তার পর আবার রোগীর শুশ্রূষার জন্য তার বাড়ীতে পড়ে থাকার মানে কি? বাড়ীর লোকে কি শুশ্রূষা জানে না? না,—সে বাড়ীর লোকের চেয়ে ভাল শুশ্রূষা করে?

এইরূপ কথোপকথনের পর সে আড্ডায় সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল পণ্ডিত ভুবন মোহন একজন বক-ধার্ম্মিক। তারপর কথা উঠিল,—"তা হলে বিবাহ করে না কেন?" তাহার সিদ্ধান্ত হইল, পণ্ডিত চালাক লোক, বিবাহ করিলে স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে, আর ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধান মত স্ত্রী যার তার সঙ্গে বেড়াবে, পণ্ডিতের তাহা ভাল লাগিবে না, তাই সে বিবাহের বন্ধনে বদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক। সে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াবে, কোন খানে বদ্ধ হবে না, আর এদিকে লোকেও তাঁহাকে সাধু বলিবে, এই তাঁর ইচ্ছা। অতঃপর প্রথম ব্যক্তি বলিল, "আচ্ছা পণ্ডিত কতদূর সাধু একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাউক না কেন?" তখন সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে তাঁহাকে পরীক্ষা করাই অবধারিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে রওনা হইল। আড্ডা ভাঙ্গিল।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল, সকলে আহারান্তে শয়ন করিল। জন-কোলাহল-পূর্ণ মুকুন্দ বাবুর বহির্ব্বাটী ক্রমে নীরব হইয়া গাঢ় অন্ধকারের ক্রোড়ে যেন বিলীন হইল। কেবল একটী কক্ষে তখন মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছিল, তাহার ক্ষীণ রশ্মী বাহিরে পড়িয়া সেই গাঢ় অন্ধকারের তত কিছুই করিতে পারিতেছিল না। এই কক্ষে ভুবন মোহন একান্ত মনে পড়িতে ছিলেন, তিনি আহারান্তে প্রত্যহই অনেক রাত্র পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকেন। ক্রমে অন্যান্য কক্ষের সকলে নিদ্রিত হইল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, তখন তিনি পড়া শেষ করিয়া শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবতীর বয়স প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ।

শরীরের বর্ণ কষিত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল। মুখখানি ঈষৎ দীর্ঘচ্ছন্দ, চক্ষু দুইটি আয়ত ও ভাসা, তাহার উপর বাঁকা ভ্রূযুগল মুখ খানির শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে একটি কাল টিপ পরিয়া যুবতী সেই মুখের শ্রী বর্দ্ধন করিয়াছে। তাহার তিলকুলোপম নাসিকার অগ্রভাগে একটি নলক দোদুল্যমান। তাহার গণ্ডস্থল ঈষৎ স্ফীত ও লোহিতাভ। মুখখানি লাবণ্যময়, তাহাতে দীপালোক প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছিল। ক্ষীণ বিম্বাধর তাম্বূলরাগে রঞ্জিত হইয়া সেই শোভার গুরুত্ব বর্দ্ধিত করিতেছিল। তাহার বাহু-যুগল মৃণালের ন্যায় গোল। হস্তে কারুকার্য্য-খচিত রঞ্জিত কাঁচের চুড়ি। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপে মনোহর খোপা বান্ধা। সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু মেঘে স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ক্ষীণ কোটিতটের নিম্নে সুপ্রশস্ত নিতম্বে একগাছি চন্দ্রহার ঝুলিয়া নিতম্বের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। উরুদ্বয় কদলী বৃক্ষের ন্যায় স্থূল। যুবতী সেই তপ্তকাঞ্চনাভ দেহখানি একখানি নীলাম্বরী সাড়ীতে সুশোভিত করিয়া মুখখানি ও পীনোন্নত স্তন-যুগল অর্দ্ধাবৃত করতঃ ভুবন মোহনের সম্মুখীন হইল। এত রাত্রে তাঁহার শয়ন কক্ষে সেই যুবতীকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কিজন্য এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ?" যুবতী তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ মধুর হাসি হাসিয়া অধোবদনে গণ্ডদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া, পদাঙ্গুষ্ঠে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে লজ্জা-বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার স্বামী আমাকে দেখিতে পারে না।"—যুবতীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইলেন,—তিনি

ভাবিলেন. হায় এ আবার কি? তখন তিনি প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেন, "প্রভো! এ আবার তোমার কেমন লীলা, পিতঃ! মঙ্গলময়! আজ এই অধম সন্তানকে এই দারুণ প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা কর। তুমি যে এ দুর্ব্বল হৃদয়ের একমাত্র বল, তুমি রক্ষা না করিলে এসময়ে আর কে রক্ষা করিবে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একবার মাতৃচরণ স্মরণ করিলেন, হৃদয়ে মাতৃভাবের উদয় হইল;—অমনি যুবতীকে কহিলেন, "মা! এত রাত্রে কেন এসেছ মা? আমি যে তোমার সন্তান মা!" এই বলিয়া তিনি "মা" "মা" বলিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখ হইতে দিব্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল, সে জ্যোতিঃ রমণীর নিকট অগ্নিশিখাবৎ বোধ হইতে লাগিল। সে ভীতা হইয়া সাষ্টাঙ্গে ভুবন মোহনকে প্রণাম করিয়া, "বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অন্যের অনুরোধে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম!" এই বলিয়া তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বাহিরে অদূরে সেই ষড়যন্ত্রকারিগণ অপেক্ষা করিতেছিল,—তাহারা ভুবন মোহনের "মা" "মা" বলিয়া উচ্চ রোদন শুনিতেছিল, সেই সময় যুবতী ক্ষুণ্ণ মনে তাহাদের নিকট আসিয়া সমুদায় বিষয় বিবৃত করিল। তাহারা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। এইরূপে ভুবন মোহন দারুণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাষণ্ডগণও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতে লাগিল। সেই হতভাগিনী রমণী পোর্জ্জনার এক সূত্রধরের কন্যা ছিল। কতিপয় নীচাশয়ের পরামর্শে স্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে থাকিয়া পাপ পথ অবলম্বন করিয়াছিল। এই ঘটনার পর তাহার মনে ধিক্কার জন্মিল, সে পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া

স্বামীর অনুগামিনী হইল। দিনাজপুরেও কয়েকজন পাষণ্ড তাঁহাকে এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিল। জিতেন্দ্রিয় ভুবন মোহন তাহাদের নিকটও এই রূপ অতুল চরিত্রবলের পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদের ভক্তি ভাজন হইয়াছিলেন।

পোর্জ্জনা পরিত্যাগ।

পণ্ডিত ভুবন মোহন পরহিতব্রত ও ধর্ম্ম-পরায়ণতায় যেরূপ সাধারণের ভক্তি-ভাজন হইয়াছিলেন সেইরূপ আবার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তাঁহার আগমনের পর হইতেই পোর্জ্জনা স্কুল প্রতি বৎসর রাজসাহী বিভাগের মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল। তাঁহার অগাধ সংস্কৃত-জ্ঞান ও বিদ্যারত্ন উপাধি প্রাপ্তির কথা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ অবগত হইয়া তাহাকে পদোন্নতির আশা দিয়াছিলেন। ১২৭২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৬৫ খৃঃ অঃ) দিনাজপুর জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে তিনি ঐ পদের জন্য আবেদন করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া গুণের সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মফঃস্বলের সাহায্যকৃত মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষকতা হইতে একেবারে জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্তি স্বপ্নাতীত উন্নতি বলিতে হইবে। অন্য কেহ এরূপ আশা-

তীত উন্নতি লাভ করিলে হয়ত অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া যাইত ; কিন্তু ভুবন মোহন যেমন তেমনই থাকিলেন। তিনি চিরদিনই,

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।"

তাই তাঁহাকে দিনাজপুর-বাসী ঋষি বলিয়া পূজা করিত।

তাঁহার এই পদোন্নতিতে পোর্জ্জনা স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রগণ ও সর্ব্ব সাধারণ হরিষ-বিষাদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় মহাত্মার পদোন্নতিতে তাহারা সকলে যার পর নাই আনন্দিত হইল ; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, কে আর তাহাদিগকে অমন মধুর স্নেহ-বাক্যে সন্তুষ্ট করিবে ? কে আর তাহাদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া বাঁচাইবে ? কে আর তাহাদের রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মধুর বচনে আশ্বাস দিয়া অক্লান্ত ভাবে পরিচর্য্যা করিবে ? তাই ভাবিয়া তাহারা দুঃখের সাগরে ভাসিল। প্রতিদিন দলে দলে গ্রাম ও গ্রামান্তরের লোক তীর্থ-যাত্রীর ন্যায় তাঁহার সহিত আসিয়া দেখা করিতে লাগিল। তিনি সস্নেহ বচনে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পোর্জ্জনাবাসিগণকে কাঁদাইয়া নিজেও তাহাদিগের সহিত কাঁদিয়া পনর বৎসর পর জন্মের মত পোর্জ্জনা পরিত্যাগ করতঃ দিনাজপুর রওনা হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

দিনাজপুর।

ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা।

সে সময় দিনাজপুর আসিতে রেল হয় নাই ; নৌকা পথে ও পদ-ব্রজে বা গো গাড়ীতে আসিতে হইত। পণ্ডিত ভুবন মোহন এই সুদীর্ঘ দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিলেন তখন তাঁহার মনে নানা চিন্তা উদিত হইল। তিনি চির দিন মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া ছাত্রগণকে বাঙ্গালা পড়াইয়াছেন,—কিন্তু সংস্কৃত ভাষা কখনও শিক্ষা দেন নাই। তিনি এই প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা দিতে চলিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি ? আবার ভাবিতে লাগিলেন দিনাজপুর কখনও দেখেন নাই, শুনিয়াছেন স্থানটী অস্বাস্থ্যকর, শরীর টিকিবে কি না, এইরূপ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মঙ্গলময়ের পাদ-পদ্মে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া যথাকালে দিনাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন দিনাজপুরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সহরে লোক-সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশই খড়ের ঘর। অনেক আফিস আদালত পর্য্যন্ত খড়ের ছিল। তখন এমন একটী হোটেল ছিল না, যেখানে কোন ভদ্রলোক আসিয়া থাকিতে পারে। ভুবন মোহনের নর্ম্মাল স্কুলের সহাধ্যায়ী ৺চন্দ্রমোহন সেন বালুবাড়ীতে ছিলেন। তিনি ট্রেনিংস্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। ভুবন মোহন তাহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে দুই বন্ধুর মিলন হওয়ায় উভয়েই

পরম আনন্দিত হইলেন, উভয়ের কত আলাপ হইল, কত প্রাণের কথা হইল। ভুবন মোহন সেই বাসায়ই পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর কয়েকটী ছাত্র ও অফিসের আমলা লইয়া তিনি বালুবাড়ীতে একটী মেস্ খুলিলেন। এক্ষণে যে স্থানে রজনী বাবু মোক্তারের বাসা হইয়াছে, ঐ স্থানেই ভুবন মোহনের মেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মধ্যম ভ্রাতা আনন্দচন্দ্র ইতঃপূর্ব্বেই ফরিদপুরের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রংপুর পুলিশের দারোগা হইয়াছিলেন। একটী ডাকাতি মোকদ্দমা তদন্ত কালে তাহার জীবন শঙ্কটাপন্ন হওয়ায় ভুবন মোহন তাঁহাকে আনাইয়া ওকালতি পাশ করাইলেন এবং ঠাকুরগাঁ মহকুমায় উকিল করিয়া দিলেন।

তখন দিনাজপুরে কোন ব্রাহ্ম-মন্দির বা ব্রাহ্ম-সমাজ ছিল না। জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার বাবু কৃষ্ণ কুমার সেন ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাসী পরম ভক্ত ছিলেন, তদ্ভিন্ন ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশী ছিল না। কৃষ্ণকুমার বাবু দিনাজপুর আসিয়া কাহারও সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া এপর্য্যন্ত সুখী হইতে পারেন নাই। তিনি প্রতি শনিবার ছুটির পর ছাত্রদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। ভুবন মোহনকে তিনি প্রথমে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমনের পরবর্ত্তী শনিবার যখন হেড্ মাষ্টার বাবু ছাত্রগণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, পণ্ডিত মহাশয়ও তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণকুমার বাবুর অনুরোধে পণ্ডিত মহাশয় দুই একটী কথা বলিলেন। তাঁহার সেই নীতি-জ্ঞান-পূর্ণ উপদেশে হেড্ মাষ্টার বাবু ও ছাত্রগণ পরম

পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোচ্ছ্বাস দেখিয়া কৃষ্ণকুমার বাবু তাঁহাকে একজন পরম ভক্ত বলিয়া জানিলেন। সেই হইতে তিনি তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

ভুবন মোহনের একটী একতারা ছিল; তিনি তাহা লইয়া রাত্রে একাকী প্রেমময়ের নাম কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। একদিন কথায় কথায় তিনি কৃষ্ণকুমার বাবুকে কহিলেন, "সকলের সমবেত স্থললিত সংকীর্ত্তনে প্রাণ যেমন মাতোয়ারা হয় একাকী ঘরে বসিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তনে সেরূপ আনন্দ হয় না। আমার ইচ্ছা হয় উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র একটী গৃহের ব্যবস্থা করি, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা ঘটিতেছে না।" কৃষ্ণকুমার বাবু তাঁহার এই যুক্তি-পূর্ণ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলেন এবং উপাসনার জন্য মালদহি-পটীতে একটী কোঠাঘর ভাড়া করিয়া লইলেন। ১৮৬৬খ্রীষ্টাব্দে এই ঘরেই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম সভার প্রতিষ্ঠা হইল। সভা প্রতিষ্ঠিত হইলেও কিন্তু সভ্য তেমন জুটিল না। হেড্‌মাষ্টার ও হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় আর তাঁহাদের দুই এক জন ছাত্র এখানে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিতেন। উপাসনার ভার হেড্‌মাষ্টার বাবুর উপর ছিল, কিন্তু তিনি তাহা অনেক সময় ভক্ত ভুবন মোহনকেই অর্পণ করিতেন।

তখন সহবাসীর ধারণা ছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলাত-প্রত্যাগত জাতি-ভ্রষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণশীল বিলাসিগণ ও তাহাদের পদাঙ্কানুসারী অসংযামগণের খাম-খেয়ালের রঙ্গভূমি; উহা খ্রীষ্ট ধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু যখন তাঁহারা পণ্ডিত মহাশয়ের সত্বগুণের পরিচয় পাইলেন, যখন তাঁহার মুখে শুনিতে পাইলেন উহা আর্য্য ঋষিগণের

অবলম্বিত আরণ্য ধর্ম্ম, তখন অনেকেই আসিয়া সেই সভায় যোগ দান করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় এই সভার সহকারী সম্পাদক হইলেন। তাঁহার যত্নে সাধু অঘোরনাথ বৎসরে দুই তিনবার দিনাজপুর আসিয়া ব্রাহ্ম সভায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। একবার তিনি মালদহ হইয়া দিনাজপুর আসিতেছেন। তখনও রেল হয় নাই। রাস্তাও জঙ্গলাকীর্ণ। পথিমধ্যে একদল ডাকাইত তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সাধু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে কিছু নাই, কেন তোমরা আমাকে আক্রমণ করিতেছ ?" ডাকাইতগণ কহিল, চুপরাও, আভি তোম্‌কো জান নেকাল দেগা।" তখন সাধু বলিলেন, "যদি একান্তই তোমরা আমাকে বধ করিবে তবে একটুকু অপেক্ষা কর, আমি একবার প্রাণ ভরিয়া জন্মের মত ভগবান্‌কে ডাকিয়া লই।" এই বলিয়া তিনি ভূমিতলে বসিয়া ধ্যান-মগ্ন হইয়া অতি সুললিত স্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ডাকাইতগণের কঠিন হৃদয়ও সে কীর্ত্তনে ক্ষণেকের জন্য দ্রবীভূত হইল, তাহারা তাঁহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। তাহারা তাঁহার প্রাণনাশ করিল না বটে, কিন্তু তাহাদের আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হইতে দিল না,—তাহারা তাঁহার পরিহিত বস্ত্র ও উত্তরীয় খানি কাড়িয়া লইল। সাধু, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতে দিতে মাজায় কতকগুলি লতা পাতা জড়াইয়া দিনাজপুরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথে একজন কৃষক তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাকে দুর্ঘটনার কথা বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া কৃষকের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। দরিদ্র কৃষক তাহাকে একখানি শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র আনিয়া দিল, সাধু পরমা

নন্দে তাহা পরিয়া দিনাজপুর আসিলে, কৃষ্ণকুমার বাবু তাহার দুরবস্থা দেখিলেন এবং দুর্ঘটনার কথা শুনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে এক জোড়া কাপড় আনাইয়া সাধুকে পরিতে দিলেন। সাধু একখানা নূতন কাপড় পাইয়া কৃষক-দত্ত জীর্ণ বস্ত্রখানি সযত্নে রাখিয়া দিলেন। কৃষ্ণকুমার বাবু তাহা ফেলিয়াদিতে চাহিলেন, সাধু বলিলেন, "উহা ফেলিবার জিনিষ নহে, উহা বড় আদরের বস্তু, দুঃসময়ে ভগবান দরিদ্র কৃষকের হস্ত দিয়া ঐ বস্ত্র আমাকে দান করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি বস্ত্রখানি ফেলিতে দিলেন না। কৃষ্ণকুমার বাবুর প্রদত্ত অপর বস্ত্রখানি তিনি একজন অন্ধকে দান করিলেন এবং বলিলেন, "তিন খানি কাপড়ে আমার কোন প্রয়োজন নাই। সাধু অঘোর নাথের এই কথা শুনিয়া দিনাজপুরবাসী সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাগ্র হইল। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিল। তার পর তাঁহার ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ-পূর্ণ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া দিনাজপুর-বাসীর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ কমিয়া গেল। দলে দলে লোক ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া যোগদান করিতে লাগিল। তখন মালদহ-পট্টীর সেই ক্ষুদ্র গৃহে আর স্থানসঙ্কুলন হইল না। তখন ভুবন মোহন বালুবাড়ীতে নিজ বাসার সম্মুখেই ব্রহ্ম-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য একটি স্থান মনোনীত করিলেন। আদর্শ হিন্দু স্বর্গীয় সার মহারাজ গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর ঐ স্থানটী ব্রাহ্ম-সভার জন্য দান করিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। সভার জন্য একখানি খড়ের ঘর নির্ম্মিত হইল।

এই সময় আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দিনাজপুরে শুভাগমন

করিলেন। তাঁহার হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতায়, দিনাজপুর মাতিয়া উঠিল। বহু ভদ্রলোক আসিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কৃষ্ণকুমার বাবু তখন বদলী হইয়া গিয়াছেন। সকলেই তখন পণ্ডিত ভুবন মোহনের প্রাণস্পর্শী-উপাসনায় মোহিত হইয়াছেন। স্বয়ং বিজয় কৃষ্ণ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সভ্যগণ তাঁহাকে ব্রাহ্ম সভার সম্পাদক ও আচার্য্য পদে মনোনীত করিলেন এবং তাঁহাকে যথারীতি দীক্ষিত করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "উহাকে আমি কি দীক্ষা দিব? ইনি দীক্ষার সীমা অতিক্রম করিয়া অতি উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন। হৃদয়ে ব্রহ্মভাব উদ্দীপিত করাই দীক্ষার প্রয়োজন। যাঁহার ব্রহ্মভাব স্বতঃ উদ্দীপিত, তাঁহার দীক্ষার আবশ্যকতা কি? যাঁহার জীবন ব্রহ্ম-ভাবে উদ্ভাসিত, যাঁহার জীবন ব্রহ্মপ্রেমে বিগলিত, তাঁহার নিকট সকলেই দীক্ষিত হইতে পারে। দিবালোকে যেমন মশালের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানালোকে যাঁহার হৃদয় আলোকিত তাঁহারাও দীক্ষার আবশ্যক করে না। পরম পিতা পরমেশ্বরই ইহার দীক্ষা-দাতা। ইহার হৃদয়ের বাঁধ ছিড়িয়াছে,—মোহের আঁধার ঘুচিয়াছে,—ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। এখন ইনি যে তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বদর্শী ও প্রবুদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" গোস্বামী মহাশয়ের কথায় সভ্যগণ অসঙ্কুচিত চিত্তে অদীক্ষিত ভুবন মোহনকেই সমাজের সম্পাদক ও আচার্য্যরূপে বরণ করিলেন। তিনি আমরণ এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি অঘোরনাথের বা বিজয় কৃষ্ণের ন্যায় সুবক্তা না হইলেও তাঁহার

ভক্তি-ভাবোদ্দীপক কথাগুলি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিত, আর তাহাতে পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যাইত। অঘোর নাথ ও বিজয় কৃষ্ণের বক্তৃতায় সহরবাসী ধর্ম্ম-পিপাসায় অধীর হইয়াছিলেন, পণ্ডিত ভুবন মোহন তাঁহাদিগকে ধর্ম্মামৃত দানে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। দিন দিন ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল,—উত্তরোত্তর সভ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সহরের নানা স্থান হইতে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিতে লাগিলেন। বালুবাড়ীর সেই ঘরে স্থান সঙ্কুলন হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। স্থানাভাবে উৎসবাদি মোক্তার রজনী বাবুর বাসায় চলিতে লাগিল। এতব্যতীত অনেক সভ্য, সভাগৃহ সহরের কেন্দ্রস্থানে না হওয়ায় অনেকের যাতায়াতের অসুবিধা বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তখন সেই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য ভুবন মোহন কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সহরের মধ্যস্থানে গনেশতলায় বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সভার স্থানটি ক্রয় করিয়া বঙ্গীয় ১২৯১ সনের ১১ই মাঘ ব্রাহ্ম-সভ্যগণের চান্দা দ্বারা অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-মন্দির স্থাপন করিলেন। এই মন্দিরের সম্মুখেই তাঁহার চিতা-ভস্ম প্রোথিত করিয়া তদুপরি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও সাধু অঘোর নাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণের সংসর্গে ও প্রতিনিয়ত ধর্ম্মালোচনায় পণ্ডিত ভুবন মোহন উত্তরোত্তর ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের বন্যা দিন দিন প্রবলতর হইতে লাগিল। উপাসনার সময় প্রেমে অধীর হইয়া কান্দিয়া ফেলিতেন,—তখন সে প্রেমের বন্যা

তাঁহাকে ভাসাইয়া সভ্যগণের দিকে ছুটিত, সভ্যগণও কান্দিয়া আকুল হইতেন। নিতান্ত শয্যাশায়ী না হইলে উপাসনার দিন কখনও তিনি অনুপস্থিত থাকিতেন না। যদি তেমন অবস্থায় কোন দিন না যাইতে পাড়িতেন তবে কত দুঃখই প্রকাশ করিতেন,—বলিতেন, "বোধ হয় কোনও অজ্ঞাত পাপে আমার উপাসনার ব্যাঘাত ঘটিল,—ভক্তগণের সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হইলাম।" আবার এদিকে তিনি অনুপস্থিত থাকিলে সভ্যগণ যুথপতিহীন মাতঙ্গ-দলের ন্যায় নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেন। ফলতঃ তিনিই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাণ এবং ব্রাহ্ম-সমাজই তাঁহার প্রাণ ছিল।

সর্ব্ব ধর্ম্মের সম্মান।

পণ্ডিত ভুবন মোহন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক হইলেও অন্য ধর্ম্মের কখনও নিন্দা করেন নাই। তিনি সকল ধর্ম্মেরই সম্মান করিতেন। একবার কলিকাতা হইতে জনৈক ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক দিনাজপুর আসিয়া ব্রাহ্মমন্দিরে দুই দিন বক্তৃতা করিলেন। তৃতীয় দিবস রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট একটী বৃহতী সভার আয়োজন হইল। তথায় ভারতের আদি ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য প্রচারক মহাশয় অনুরুদ্ধ হইলেন। পণ্ডিত ভুবন মোহন ও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। প্রচারক মহাশয় সুললিত কণ্ঠে ও ভাষার পারিপাট্যে শ্রোতৃ-বৃন্দের শ্রুতি-সুখোৎপাদন করিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। বক্তৃতান্তে পণ্ডিত মহাশয়ের নির্দ্দেশানুযায়ী শাস্ত্রালোচনা হইবার কথা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব

শুনিয়া প্রচারক মহাশয় অবাক্ হইয়া পাড়লেন। তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, ব্রাহ্ম-সভায় হিন্দু-শাস্ত্রালোচনার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া এক আপত্তি উথাপন করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভুবন মোহন, প্রচারকের ভিত্তি-হীন আপত্তিতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এই বিবিধ বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্ব-জগতের স্রষ্ঠা যদি, একমাত্র পরম পিতা বিধাতা হন, আমার বিশ্বাস, সকল ধর্ম্মের স্রষ্টা বিধাতাও তিনি। বিভিন্ন ধর্ম্ম সমূহ, সেই পরাৎপর পরম পিতার চরণ-প্রান্তে পৌছিবার পথ মাত্র। কোন স্থানে পৌছিবার নিমিত্ত যেমন নানা দিকে পথ থাকে,—তাহার কোনটি বক্র, কোনটি সোজা, কোনটি জলময়, কোনটি বন্ধুর বা অরণ্যময়, যে কোনটি অবলম্বন করিলেই সেই গন্তব্য স্থানে গমন করা যায়, সেইরূপ যে কোন ধর্ম্মাবলম্বন কর, অন্তিমে সকলেই পরম পিতার পদ-প্রান্তে মিলিত হইতে পারিবে, ইহা আমার প্রাণগত ধারণা ও বিশ্বাস। ভগবান্‌ই ধর্ম্ম স্বরূপ। যাঁর যে ধর্ম্মে বিশ্বাস তিনি সেই ধর্ম্মেই তাহাকে প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। সুতরাং ধর্ম্মের নিন্দা করিলে প্রকারান্তরে ভগবানেরই নিন্দা করা হয়। সকল ধর্ম্মেরই মূলাধার, ব্রহ্ম। মূলধর্ম্ম অব্যক্ত,—তাহা আত্মার নিকেতনে নিহিত। আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিলে সেই সর্ব্ব-জনীন,—বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে জানা যায়। তাই মহা যোগী মহাদেব জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রে পার্ব্বতীকে উপদেশ দিয়াছেন,—

"উচ্ছিষ্টং সর্ব্ব শাস্ত্রানি সর্ব্ব বিদ্যা মুখে মুখে
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্।
যাবদ্বর্ণং কুলসর্ব্বং তাবৎজ্ঞানম্ ন জায়তে
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ব বর্ণ বিবর্জ্জিত।"

সর্ব্ব-শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, এবং সকল বিদ্যাই মুখে মুখে রহিয়াছে। অর্থাৎ অধ্যয়নাদি দ্বারা সকলেই শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিতে পারে; কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞান অব্যক্ত,—তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না।—শুদ্ধ চেতনা ময়,—কেবল চেতনা বা বিবেক; ধ্যান-ধারণাদি আত্মজ্ঞান দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে। এজন্য তাহা এপর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই। সেই ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই জাতিকুল-ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভেদ-জ্ঞান থাকে,—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে সকল ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়।

যে দেশের যে সাধকগণ যখন যে ভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাকে সাধনালব্ধ জ্ঞানরাশিই বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"বদন্তি তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ব্রহ্মেতি,
পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে
সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্মেতি।"

'তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই অদ্বয় অখণ্ড জ্ঞানকেই কেহ আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা ভগবান্ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন।' সেই জ্ঞান পরমাত্মাতে নিহিত। তাহা অব্যক্ত, একমাত্র উপলব্ধির বিষয়। জীবাত্মা সংসারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সংসার সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয় ঘটিত যাবতীয় জ্ঞানই জীবাত্মার আশ্রিত। এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপার ঘটিত বলিয়া মন ও বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু পরমাত্মা অবাঙ্-মনোগোচর, —পরমাত্মা, মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়গণের অগোচর বলিয়া তাহা অব্যক্ত,—একমাত্র আত্মাদ্বারা উপলব্ধির বিষয়। সেই পরাৎপর পরমাত্মা পরব্রহ্ম কে আর্য্য ঋষিগণ যিনি যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার জন্য,—অল্প বুদ্ধি মানবের বোধগম্যের জন্য, রূপক

ভাবে অসামান্য শক্তি বিশিষ্ট ভগবান্ প্রভৃতি আখ্যা দিয়া উপন্যাসাকারে চিত্রিত করিয়াছেন। একই ব্রহ্ম-তত্ত্ব রূপক-ভাবে বুঝিলে হিন্দু-শাস্ত্র, আর রূপক-ভাব বাদ দিয়া সারটুকু,—আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিলেই পরব্রহ্মতত্ত্ব। সুতরাং ব্রাহ্মসভায় হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনায় কি আপত্তি আছে তাহা জানিনা। সর্ব্ব জ্ঞানের সারই ব্রহ্মজ্ঞান, এবং সকল ধর্ম্মের সারই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সকল ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া, সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে হয়, নতুবা হওয়া যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্ম-সামঞ্জসীভূত সার ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। অতএব ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-সভায় সকল ধর্ম্মই আলোচ্য ও বিবেচ্য। কিন্তু সকল ধর্ম্মের সার সত্যটুকুই গ্রাহ্য। গীতায় পরমাত্মারূপী ভগবান জীবাত্মা-রূপী অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, আমরা গীতাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিব।"

অতঃপর সভ্যগণ পণ্ডিত মহাশয়ের এই যুক্তি-পূর্ণ বাক্যের সমর্থন করিলেন,—সভায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা হইল।

বিক্রমপুর বাটীতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একখানা পুরাতন ডাইরীতেও তাঁহার এই উদার ধর্ম্ম-মতের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আজ ষষ্ঠী,—মঙ্গলময়ী জগজ্জননীর জন্য তাঁহার সন্তান মাতোয়ারা! —মা আসিবেন,—ভারতব্যাপী এক মহানুষ্ঠান,—মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। মা আসিবেন, মঙ্গলময়ীর আবির্ভাবে সকল দুঃখ যাতনা ঘুচিয়া যাইবে, তাঁহার ভক্ত সন্তান প্রাণ মন দিয়া পূজা করিবে। কিন্তু আমরা তাঁহার প্রকৃত পূজার অধিকারী কি না? আমাদের পূজার উপহার কিছু নাই,—হৃদয়ে ভক্তি নাই, প্রীতি নাই, সেই ভাবে হৃদয়কে

প্রস্তুত করি নাই, কি করিয়া তাঁহার পূজার অধিকারী হইব? তাঁহাকে আমাদের হৃদয়াসনে বসাইতে পারি কৈ? তবে কিরূপে তাঁহার মাঙ্গল্য লাভ করিব? কিরূপে আমাদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচিবে? প্রতি বৎসর শারদীয়া মা আসিতেছেন, কেবল আমোদ-উৎসবেরই মহাড়ম্বর মহাঘটা। চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল শুনিতেছি, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পূজা করিতেছি কি? প্রকৃত পূজাও হইতেছে না, আমাদের দুঃখ-দৈন্যও ঘুচিতেছে না; হৃদয় বলীয়ান্ হইতেছে না!

সপ্তমী ২৭শে মঙ্গলবার মঙ্গলময়ীর পূজার দিন উপস্থিত। মা আজ ভক্ত-হৃদয়ে জননী রূপে দেখা দিয়াছেন, তাই আজ কত আনন্দ-ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। আমি আজ এই শুভ দিনে মহাজনগণের গঞ্জনা, পরিবারের গঞ্জনা সহ্য করিয়া, দুঃখের বোঝা বুকে করিয়া মায়ের মঙ্গল কর নাম স্মরণ করিব তিনি সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করিবেন।"

তাঁহার বালুবাড়ী বাসায় উত্তর দিকে একটি ভাঙ্গা মস্‌জিদ ছিল, একদিন তিনি দেখিলেন সেই মস্‌জিদে একজন ব্রাহ্মণ বাহ্যে করিতেছে, তিনি তাহাতে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং ব্রাহ্মণটি মস্‌জিদ হইতে বাহির হইলে, তাঁহাকে কহিলেন, "ঠাকুর মহাশয় আপনি না হিন্দুর ধর্ম্মগুরু? আপনি সেই বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণ হইয়া এরূপ একটি অন্যায় কাজ করিলেন? আপনার ন্যায় সুবোধ লোকদ্বারা ধর্ম্মস্থানের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। যে স্থানে একদিন বিশ্বপূজ্য বিশ্ব-বিধাতার উদ্দেশে 'আল্লাহো আকবর!' 'খোদা তাল্লা'! বলিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানগণ তাঁহার নাম করিয়া, নমাজ উপাসনা করিত, যে স্থানে বিশ্ব-দেবের পীঠস্থান বলিয়া আপনার অপেক্ষা মহা-

.মালানা, পীর-দরবেশ. নবাব-বাদসাদেরও,
হইত, যেস্থান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আবির্ভাব-স্থান
.ণ প্রীতি-উপহার ঢালিয়া দিত,—আপনি আজ
হসে,—সেই পবিত্র তীর্থে মল ত্যাগ করিয়া
নুষের কাজ ?—ঈশ্বরের ন্যায়, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত,—
এবং পূজ্য। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত স্থানের অবমাননা
না করা হয়। যে স্থানে উপস্থিত হইলে মন
ল হয়, তাহাই তীর্থ ;—
ন্দরং, তীর্থং তুলসীকাননং"।
অবমাননা দেখিয়া আপনাকে কটূক্তি প্রয়োগ
হইবেন না। আপনাকে মন্দ বলি নাই,—
লিলাম।" ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া অর্বাক্
তান্ত লজ্জিত হইয়া বাসায় চলিয়া গেলেন।
যোগদান করিয়া মাড়োয়ারীগণকে উৎসাহিত

সর্ব্ব ধর্ম্মানুরাগ ও ভগবদ্বিভূতির উপলব্ধি, কে
ন জানিনা। আমরা তাঁহাকে কিন্তু এই সকল
গেী বলিয়াই ভক্তি করিব। ভগবান্ গীতায়

পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
ন প্রণশ্যামিসচ ন মে প্রণশ্যতি।"
নই আমরা তাঁহার সাযুজ্যলাভের স্থির সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে পারিয়াছি এবং এই জন্য ... একটি মহাত্ম বলিয়া পূজিত হইয়াছেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারত্ব

যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকগণ ... পথ ব্যতীত উদ্ধারের অন্য পথ নাই বলিয়াছেন ... এ সম্বন্ধে উদার। হিন্দুর বেদ বলিয়াছেন,—

"একংসৎ, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি

গীতায় আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বি... ন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্ত

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পা

ভুবন মোহন এই উদার মতই হৃদয়ে ... তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বা... ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়েন নাই। যে, যে ... সে তাহা যাজন না করিলে তিনি বরং অসন্তুষ্টই হইতেন

বালুবাড়ীর স্বর্গীয় রসিক বাবু মোক্তারের ... নিয়োগী মহাশয়ের একবার ওলাউঠা হইল, একজন ... টির নাম জাদা ডাক্তার ও একজন কবিরাজ তাহার অব... বাব দিলেন। আমরা অগত্যা অগতির গতি পণ্ডিত মহাশ... পন্ন হইলাম। তিনি তাঁহার হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। রোগীর যখন যে অবস্থা হইতে লাগিল তাহাই পণ্ডিত মহাশয়কে জানানর ব্যবস্থা হইল। বেলা দুই প্রহরের সময় রোগী কালীমূর্ত্তির

বিভীষিকা দেখিয়া প্রলাপ বকিয়া উঠিল। পণ্ডিত মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন, "বাবা! আপনারা সন্ধ্যা বেলা উহার নিকট বসিয়া শ্যামা বিষয়ক গান শুনাইবেন। কারণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসে লোককে সঞ্জীবিত করে। বোধ হয় উহার মনে কালী বিষয়ের কোন কল্পনা তখন উদয় হইয়াছিল তাই তিনি এইরূপ বিভীষিকা দেখিয়াছিলেন।" ব্রাহ্মাচার্য্যের মুখে শ্যামা-সঙ্গীতের উপদেশ শুনিয়া অবাক্ হইলাম। সন্ধ্যা বেলায় রোগীকে শ্যামা-সঙ্গীত শুনান হইল, অতঃপর পণ্ডিত মহাশয়ের সুচিকিৎসায় সেই ডাক্তার-কবিরাজ-পরিত্যক্ত মুমূর্ষু-রোগী আরোগ্য লাভ করিল।

একদিন দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার রায় রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কোন ধর্ম্ম ভারতে জাগ্রত মনে করেন?" ব্রাহ্মাচার্য্য পণ্ডিত মহাশয় এস্থলে স্বীয় ধর্ম্মের মান বাড়াইবার জন্য অনায়াসে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকেই জাগ্রত ধর্ম্ম বলিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না! তিনি অসংকোচে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় মুসলমান-ধর্ম্মই এক্ষণে জাগ্রত, কারণ তাহাদের আমীর ওমরাহ্ ও নবাব হইতে দরিদ্র এবং মৌলবী হইতে নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই যথাসময়ে যথারীতি উপাসনা করে,—বালকগণ পর্য্যন্তও রোজা করে ও নমাজ পড়ে। এমন ধর্ম্মনিষ্টা আর কোন সম্প্রদায়ে দেখা যায় না। রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহাশয়ের এই নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব হইলেও পণ্ডিত মহাশয়কে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত জানিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁহাকে যার পর নাই শ্রদ্ধা

করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মতি মতে, ১৮৯৫ সনে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, রায় সাহেব বাহাদুর প্রত্যহ তাঁহার জন্য গোবিন্দ জীউর ভোগ পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ভক্তি সহকারে তাহাই খাইতেন। তিনি অন্তিম কাল পর্য্যন্ত এই প্রসাদ পাইয়া আসিতে-ছিলেন।

অপৈশুন্য।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, দৈবী সম্পদ লাভ না করিলে কেহ ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না। অপৈশুন্য সেই দৈবী সম্পদের একটী সোপান, পণ্ডিত ভুবন মোহন এই গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনও কাহারও নিন্দা করেন নাই। এবং পরনিন্দা তিনি কখনও শুনিতে ভাল বাসিতেন না। একদিন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহার সমক্ষে দিনাজপুর সহরের একজন দুশ্চরিত্র ভদ্র-সন্তানের নিন্দা করিলেন। তিনি তাহাদের কথায় বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে কহিলেন, "আপনারা তাঁহার যে সকল দোষের কথা বলিলেন তাঁহার সে দোষ থাকিতে পারে কিন্তু আপনাদের নিন্দা করা পাপ। আমি জানি তিনি একজন পরোপকারী মহাপ্রাণ।" বাস্তবিক পক্ষে সেই ভদ্রলোকের দোষরাশির মধ্যে পরোপকারিতা গুণটি বেশ ছিল। ভদ্রলোকগণ তাহা স্বীকার করিলেন এবং পরনিন্দা করার জন্য লজ্জিত হইলেন।

সংসার ত্যাগে বাধা।

• তিনি অনেক দিন হইতেই সংসার বিরাগী হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার

বিক্রমপুরস্থ ভবনে লিখিত ডাইরী দৃষ্টেই বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "সংসার কেবলই বিষাদের। আমি সংসারের উন্নতির জন্য যে প্রকার চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকি তাহার একাষ্টমাংশও পরম পুরুষার্থ ধর্ম্মার্জ্জনে নিয়োগ করিলে, সুখশান্তির প্রস্রবণে ভাসমান থাকিতে পারিতাম, অতএব অন্তর্য্যামী পরমাত্মন্! তোমার নিকট আমার, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা যে, আমি যেন তোমার এই মায়াময় সংসার-কণ্টকের যন্ত্রণা সহ্য না করি। অর্থাৎ সংসারে লিপ্ত না হই। হে বিভো! এইটি আমার অন্তরের কথা। ধর্ম্ম ও বিশ্বাসানুযায়ী আচরণ করিলে, যদি জগৎসংসার, আমার আপন বা আমার উপর খড়্গহস্ত হয় তাহা যেন আমি সহ্য করিতে পারি। হে পরমেশ! আমাকে ইহা হইতে রক্ষা কর; আমি বড়ই প্রবল স্রোতে নিপতিত, তোমা ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় নাই।" আর তাহার পরদিনের ডাইরীর একস্থানে লিখিয়াছেন,—"হে বিভো! আমার যেন সংসারে মতি না হয়, তোমার চরণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা।" এই ভাব লইয়া এত দিন ভুবন মোহন নির্লিপ্ত সংসারী হইয়া সংসারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৮৮০খৃঃ অব্দে একদিন বালুবাড়ী বাসগৃহে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় উপর হইতে একটি বিড়ালী তাহার স্কন্ধে পতিত হইল। তখন তাঁহার মনে বৈরাগ্যের স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, গৃহাশ্রমে থাকিলে ধর্ম্মকার্য্যের এইরূপ নানা বাধা-বিঘ্ন ঘটে বলিয়াই আর্য্যঋষিগণ অরণ্যে আশ্রয় লইতেন। এই ভাবিয়া তিনিও বনগমনের অভিলাষী হইলেন। সেই কথা ঠাকুর গাঁয়ে তাঁহার মধ্যমাগ্রজ আনন্দ চন্দ্র শুনিতে পাইলেন। এদিকে তাঁহারও এক বিপদ ঘটিল, তাঁহার

সহধর্ম্মিণী নয় দিনের একটি বালক রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। একদিকে পত্নীর শোক, অপরদিকে শিশু সন্তানের রক্ষা ও ভ্রাতা ভুবন মোহনকে সংসার ত্যাগে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাসায় আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিল না, যে সেই মাতৃ-হীন শিশুকে প্রতিপালন করিতে পারে। ভুবন মোহনের বাসায় তাঁহার মাতা ও বিধবা ভ্রাতৃবধূ থাকিতেন। কিন্তু ঠাকুর গাঁ হইতে দিনাজপুর ৩৫ মাইল পথ। গো-গাড়ীই যাতায়াতের একমাত্র উপায়। এই দীর্ঘ পথ সেই অপগণ্ড শিশুকে লইয়া আসাও নিরাপদ নহে। নিতান্ত নিরু-পায় হইয়া আনন্দ চন্দ্র সেই শিশু ও অপর পুত্রকন্যাগণ সহ অবিলম্বে বালুবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভুবন মোহনকে কহিলেন, "ভুবন! আমি শুনিলাম তুমি নাকি সংসার পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। আমি তোমার ধর্ম্ম-কার্য্যে বাধা দিব না, কিন্তু আমার একটি অনুরোধ তোমাকে শুনিতে হইবে,—আমি এই সদ্যোজাত শিশু ও বালক বালিকাগণ লইয়া বিপদ-সাগরে ভাসমান; ইহাদিগের লালন পালন ও শিক্ষাদান করিবার ক্ষমতা আমার নাই। ইহারা অশিক্ষিত হইয়া পাপাচারী হইলে পিতৃপুরুষগণ নিরয়গামী হইবেন, আমরাও লোক-সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইব। এবং কর্ত্তব্যাবহেলার জন্য আমাদিগকে পাপী হইতে হইবে। আমি আজ ইহাদিগকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম, এক্ষণে যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর।" ভুবন মোহন তখন অনন্যোপায় হইয়া সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সেই মাতৃহীন বালক বালিকাগণের ভার গ্রহণ করিলেন। নবজাত শিশুটির জন্য ছাগ-দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সময় পাইলেই নিজে তাহার তত্ত্বাবধান

করিতেন। মাতা ও ভ্রাতৃবধূ বিধবা; সুতরাং, সর্ব্বদা শিশুর পরিচর্য্যা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব; আর স্তন্য দুগ্ধ না হইলে বালকের জীবন রক্ষা হওয়াও সম্ভবপর নহে, এজন্য তিনি একটি শিশুকন্যাবতী রাজবংশী জাতিয়া স্ত্রীলোককে পরিচারিকা নিযুক্ত করিলেন। শিশু তাহার স্তন্যও খাইতে লাগিল। এই শিশুই আমাদের বর্ত্তমান কৃতী বাবু জগদীশ চন্দ্র কর। শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছিলেন বলিয়া পারিবারিক লোক তাহাকে প্রথমে দুখু বলিয়া ডাকিত; পরে পণ্ডিত মহাশয় নাম রাখিলেন জগদীশ চন্দ্র।

এইরূপে বাধা পাইয়া ভুবন মোহন সংসার ত্যাগ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত যোগীর ন্যায় সংসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে।

দিনাজপুর আসিবার কয়েক বৎসর পর, ভুবন মোহন একবার, মাঘোৎসব উপলক্ষে, কলিকাতায় গেলেন। তখন ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র বর্ত্তমান। ব্রহ্মানন্দের অমৃত-বর্ষিণী বক্তৃতায়, তিনি যার পর নাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার পূর্ব্বে সুদুর্ব্বোধ্য ব্রহ্মতত্ত্ব যে, সরল ও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না। সেই সময়েই ব্রাহ্মাচার্য্য বিজয় কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বিজয় কৃষ্ণ, তাঁহার অতুল ধর্ম্মানুরাগ ও অসীম ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভুবন মোহনকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। যে কয়েক দিন ভুবন মোহন তথায় ছিলেন সে কয়েকদিন তিনি সহস্তে

তাঁহাকে সযত্নে নানাবিধ নিরামিষ খাদ্য পাক করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। অতঃপর বিজয় কৃষ্ণ দিনাজপুর আসিয়া ভুবন মোহনের আশ্রমেই থাকিতেন; তাঁহাকে লইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে ধ্যান-যোগাদি শিক্ষা দিতেন।

ভুবন মোহন স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। একবার তিনি কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ভক্ত্যুপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে প্রীতি সম্বর্দ্ধনায় সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষেত্রে।

১৯১৩ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে,ভুবন মোহন কতিপয় আত্মীয় ও আত্মীয়া সহ পুরী গিয়াছিলেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের নিকট গিয়াই তিনি প্রেমাকুলিত নেত্রে কহিলেন, "এই স্থানই চৈতন্য দেবের শেষ লীলাভূমি।" তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়া যার পর নাই পুলকিত হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তি গদ গদ হৃদয়ে পুরীর সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী আমাশয় রোগে আক্রান্তা হয়েন, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া প্রেমোন্মত্ত ভাবে ভ্রমণ করিতেন। প্রত্যাগমন কালে কলিকাতা হইয়া আসিলেন। সেই সময়ে একদিন দেখিলেন কালীঘাটে একজন গায়ক মধুর কণ্ঠে গাহিতেছে,—

"এ দুনিয়া গোলক ধাঁধাঁ ভাই
মায়ার বাঁধন এ সংসার—
এ দেহ তোর মাটির ছবি—
মাটিতে কর বিহার।

আতর গোলাপ সাবান মাখ ভাই
এত যত্ন কর কার ?
এ দেহের তোর পতন হ'লে
শৃগালে করবে মাংসাহার।
কিসের জন্য দিশে হারা
কিসে এত অহঙ্কার।
এদেহ তোর মাটি হবে
চিহ্ন নাহি রবে আর।
ধন জন পরিবার
মিছে বল আমার আমার
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি
ভেবে দেখ (মন) কেবা কার ?
নীলকণ্ঠ বলে ভাব হরির
রাঙ্গা চরণ মন আমার !
শেষের দিনে সেজন বিনে
অন্য গতি নাহি আর।"

এই গান শুনিয়া ভুবন মোহন ভাবে বিভোর হইলেন। দুই চক্ষে অবিরল প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল।

অমানিত্ব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের ব্যাভিচারে, সর্ব্বত্রই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ, কেশব

চন্দ্র, সাধু অঘোর নাথ, বিজয়কৃষ্ণ ও ভুবন মোহনের ন্যায় দুই চারিজন প্রকৃত মহাত্মা সমাজে থাকিলেও, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে গণনার মধ্যে ধরিতেন না। এতদ্ব্যতীত হিন্দুসমাজ, হিন্দুশাস্ত্রের বহির্ভূত কোরাণ ও বাইবেলের উপদেশ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই অসম্মত; সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজকে অস্পৃশ্যই মনে করিতেন। যে সময়ে ভুবন মোহন, দিনাজপুরে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন, তখন তথায় হিন্দু-সমাজ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর বন্ধনে সম্বদ্ধ ছিল। অঘোর নাথ ও বিজয় কৃষ্ণ প্রভৃতি বাগ্মিগণের সুললিত বক্তৃতা শুনিবার জন্য, স্কুলের ছাত্র-গণ, নিতান্ত উৎসুক হইলেও, অভিভাবকগণের কঠোর শাসনে তাহা অনেকেই শুনিতে পারে নাই। যদি কেহ লুকাইয়া, ব্রাহ্মসভায় বক্তৃতা শুনিতে যাইত, তাহার অভিভাবক তাহা জানিতে পারিলে, তাহাকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন, ছাত্র ব্যতীত কোন ভদ্রলোক ব্রাহ্মসভায় গেলে সমাজ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইত। তিনি সমাজচ্যুত হই-তেন!—ব্রাহ্ম সভার বক্তৃতা শুনিতে গেলেই যখন এই দশা, তখন যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন তাঁহাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পণ্ডিত ভুবন মোহন এই ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা; সুতরাং তিনি নিরামিষ-ভোজী ভগবদ্ভক্ত হইলেও, হিন্দু-সমাজের পক্ষে গুরুতর অপরাধী বলিয়া গণ্য হইলেন। তাঁহার সমাজভুক্ত ব্যাভিচারিগণের সঙ্গে তিনি জাতি-চ্যুত বলিয়া গণ্য হইলেন। হিন্দু-সমাজ তাহাদের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন।—ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত কেহ পুনরায় হিন্দু-সমাজে আসিতে চাহিলে তাহাকে যথা বিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। এই-রূপে সহরে দলাদলি আরম্ভ হইল। ক্রমেই সে দলাদলি সুদৃঢ় হইতে

লাগিল। হিন্দুগণ, ব্রাহ্মদিগকে হুঁকা দেওয়া বন্ধ করিলেন,—খাওয়া দাওয়া ত দূরের কথা! কিন্তু ভুবন মোহন কখনও কাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন নাই। কোন স্থানে পুরাণ-পাঠ হইতেছে শুনিলে, তিনি অনিমন্ত্রিত হইলেও তথায় যাইতে অপমান বোধ করেন নাই। কিন্তু তাহাতেও হিন্দুসমাজ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশে ক্ষান্ত হয় নাই। একদিন তিনি একবাসায় পুরাণ-পাঠ শুনিতে গেলেন; দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া সকলে পাঠককে ইঙ্গিত করিলেন; তিনি সভাস্থ হইবা মাত্র সেদিনের মত পুরাণ-পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। পুরাণ-পাঠ শুনিতে না পাইয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অবমাননার জন্য তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন না।

ভুবন মোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাদব চন্দ্র দিনাজপুর জজ আদালতে চাকুরী করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়চন্দ্রের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, তিনি পৃথক হইয়াছিলেন; এবং ভুবন মোহন, ব্রাহ্ম-সভার জন্য বালুবাড়ীর যে স্থানটুকু দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের নিকট হইতে লইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসভা গণেশ তলায় স্থানান্তরিত হইলে তিনি তথায় পৃথক বাসা করিয়া বাস করিতেছিলেন। ১৮৯৫খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে যাদব চন্দ্রের প্রথমা কন্যার বিবাহ স্থির হইল। যাদব চন্দ্র তখন ভুবন মোহনের ব্রাহ্ম-সমাজ ভুক্ত, পাত্রের পিতা হিন্দু! তিনি বলিলেন, হিন্দুমতে বিবাহ না হইলে তিনি পুত্রকে বিবাহ করিতে দিবেন না। অগত্যা যাদব চন্দ্র হিন্দু-সমাজের শরণাপন্ন হইলেন। নেতৃগণ বলিয়া উঠিলেন,—যদি তিনি ভুবন মোহনের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত ও কালী

পূজা করিতে পারেন, তবেই তাঁহাকে তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। এই শুনিয়া যাদবচন্দ্র বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। একদিকে দারুণ কন্যাদায়,—অপর দিকে ভ্রাতৃবর্জ্জন! কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিষণ্ণ বদনে বাসায় গিয়া, বসিলেন। ভুবন মোহন এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ যাদব চন্দ্রকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়া কহিলেন, "তুমি দুঃখিত হইওনা। সকল ধর্ম্মই এক। কালীপূজা, সেই ব্রহ্মেরই আরাধনা। তুমি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে হিন্দু-শাস্ত্রোচিত ব্যবস্থানুযায়ী কন্যা সম্প্রদান কর তাহাতে আমি কিছু মাত্র দুঃখিত হইব না। হিন্দু-সমাজ যখন আমার সংশ্রব ত্যাগ করার জন্য তোমাকে বলিয়াছে তাহাতে তোমার সম্মত হওয়াই কর্ত্তব্য; কারণ আমি তাহাদের বিরুদ্ধ-সমাজভুক্ত। আমি তোমার সমাজিকগণের সঙ্গে না মিশিলেও আমিত স্থানান্তরে যাইতেছি না। এরূপ অবস্থায় আমার সংশ্রব ত্যাগে তোমার অসম্মত হইবার প্রয়োজন কি?" ভুবন মোহনের মহানুভবতায়, যথাকালে যাদবচন্দ্রেব কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। হিন্দুসমাজের নেতৃগণও ভুবন মোহনের এই উদারতার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা।

পাঠক অবগত আছেন, আনন্দ চন্দ্র কর মহাশয় তাঁহার পুত্রগণের শিক্ষার ভার ভুবন মোহনের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ভুবন মোহন তাহাদের শিক্ষা সুবন্দোবস্ত করিলেন কিন্তু বালকগণ পড়াশুনায় তেমন মনোযোগী ছিলনা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। একবার ধর্ম্মসভায় জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে যাত্রা গান

হইবে। আনন্দ চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র জগদীশ চন্দ্র তখনও শিশু সুতরাং তদ্ব্যতীত অপর তিনি পুত্র সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি খাইয়া গান শুনিতে গেল। সেখানে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত ছাত্রের সহিত দিনাজপুরের মহারাজার কয়েক জন বরকন্দাজের একটুকু কথান্তর হয়। আনন্দ চন্দ্রের পুত্রগণ ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া বরকন্দাজগণকে নিদারুণ প্রহার করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। তখন রাত্রি প্রার এগারটা, ভুবন মোহন তখন পড়িতেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ দৌড়িয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রত্যাগত হইল দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়াছিলে? এত রাত্রে কোথা হইতে আসিলে?" "ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় চন্দ্র কহিল, "ধর্ম্ম সভায় জগদ্ধাত্রী পূজায় গান শুনিতে গিয়াছিলাম।" তিনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; অত জিজ্ঞাসা করিবার সময়ও তাঁহার ছিল না, তিনি তখন শাস্ত্রাধ্যায়নে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

পরদিন মহারাজার বরকন্দাজগণ অক্ষয় প্রভৃতি বালকগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা স্থাপন করিল। স্থানীয় কোন কোন উকিল মোক্তারের ছেলেরাও এই মোকদ্দমার আসামি হইল। এজন্য মহারাজা স্থানীয় উকিল মোক্তারের সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া, স্বীয় সম্মান সংরক্ষণ জন্য কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার ও অন্যত্র হইতে উকিল আনাইলেন। মোকদ্দমা গুরুতর ভাবে চালিতে লাগিল। অক্ষয় চন্দ্রের পিতা আনন্দ চন্দ্র সেই সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর গাঁ হইতে আসিলেন। স্থানীয় উকীলগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, ভুবন মোহন যদি সাফাই দেন,—তিনি যদি বলেন, অক্ষয় রাত্রি দশটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত বাড়ীতেই ছিল তবেই রক্ষা নচেৎ দণ্ড অনিবার্য্য। এইরূপ পরামর্শ করিয়া

আনন্দ চন্দ্র বাসায় আসিয়া ভুবন মোহনকে বলিলেন,—"ভুবন! আজ আমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইতে উদ্যত হইয়াছে। মান গেলে আর আমি লোক-সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না,—তাহা হইলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।" এই বলিয়া আনন্দ চন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভুবন মোহনের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভুবন! বল, আমার কথা রাখিবে কি না?"

ভুবন। আপনি বলুন আপনার কথা না শুনিয়া আমি কি বলিব?

আনন্দ। ঘটনার দিন রাত্রি দশটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত অক্ষয় বাসায় ছিল তুমি এইরূপ সাক্ষ্য না দিলে, অক্ষয়ের ফাটক হইবে,—বংশের কলঙ্ক হইবে,—আমি লোক-সমাজে বাহির হইতে পারিব না।

ভুবন। মেজদাদা! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ আপনার অনুরোধ আমার সর্ব্বথা পালনীয় ও শিরোধার্য্য, কিন্তু দাদা! সত্যই ধর্ম্ম, আমি আজন্ম যে সত্যের সেবা করিয়া আসিতেছি, আমি প্রাণান্তেও সে সত্যে জলাঞ্জলি দিতে পারিব না। অক্ষয় জেলে যাউক বা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলুক, আমি মিথ্যা কথা কহিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব না। তজ্জন্য সমগ্র পৃথিবী আমার প্রতিকূল হইলেও আমি সত্য হইতে বিচলিত হইতে পারিব না। আপনি আমার গুরুজন ও জ্ঞানী, আশা করি আপনি পুত্রবাৎসল্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে অসদুপদেশ প্রদান করিবেন না।

ভুবন মোহনের কথায় আনন্দচন্দ্র একেবারে হতাশ হইলেন। যথা-সময়ে দারোগা গিয়া ভুবন মোহনের জবান বন্দী লইল। তিনি প্রকৃত কথা বলিলেন। অক্ষয় চন্দ্র চালান হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এই ঘটনায় ভুবন মোহনের সত্যনিষ্ঠা সমস্ত সহরে পরিব্যাপ্ত

হইল। হাকিমগণও ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ জানিয়া যার পর নাই ভক্তি করিতে লাগিলেন।

এক ব্রাহ্মণকে তিনি এক জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য লইয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন পর ব্রাহ্মণ কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন এইরূপ 'অভিযোগে একটি মোকদ্দমায় পড়েন। তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রতা প্রমাণের জন্য ভুবন মোহনকে সাক্ষী মানিলেন। চাকুরী হওয়ার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বাসার প্রায় বৎসর কাল ছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার চরিত্র ভালই জানিতেন। ভুবন মোহনের এইরূপ সাক্ষ্যেই বিচারক ব্রাহ্মণকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া অব্যাহতি দিলেন।

ক্ষমা।

(১)

পাঠক অবগত আছেন পণ্ডিত ভুবন মোহন, আনন্দ চন্দ্রের কনিষ্ঠ শিশু পুত্রের লালন পালন জন্য একজন দেশীয়া কন্যাবতী চাকরাণী রাখিয়াছিলেন। ক্রমে কন্যাটী বড় হইয়া আনন্দ চন্দ্রের কন্যা সরলার সহিত লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। কন্যাটী বেশ ফুট ফুটে সুন্দরী, এজন্য তাহার মাতা প্রভৃতি সকলে তাহাকে সাহেবাণী বলিয়া ডাকিত, পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম রাখিলেন সুনীতিবালা। তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি তাহাকে স্কুলে নিম্ন-প্রাথমিক পর্য্যন্ত পড়াইয়া, নিজে বাড়ীতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলেন। তাহাকে অনেক সময় নিজে কত নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার সুশিক্ষায় সুনীতিবালা নীতি-পরায়ণা ও সুশীলা হইয়া উঠিল।

সে পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ অনুরক্তা হইল। সর্ব্বদা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। সে তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। কোনও রোগী আসিলে তাঁহার নির্দ্দেশ মত সে ঔষধ দিত।

ক্রমে সুনীতি বালা কৈশরে পদার্পণ করিল। তাহার রূপ-লাবণ্য দিন দিন প্রকটিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কতিপয় নীচাশয়ের পাশবিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহারা দেখিল সুনী-তিকে তাহার মাতাসহ ভুবন মোহনের বাসা হইতে বাহির করিতে না পারিলে আর তাহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন তাহারা, তাহার মাতাকে বেশী বেতনের প্রলোভন দেখাইল। তাহার মাতা ভুবন মোহনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাহার নূতন মনিবের বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইল। সুনীতিকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিল, কিন্তু সে শৈশব হইতে যাঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছিল, পণ্ডিত মহাশয় যে তাহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের সেই স্বর্গীয় স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া সে মাতার অনুসরণে সম্মতা হইল না। মাতা তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিল, ভুবন মোহনও তাহাকে কত বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই সে যাইতে চাহিল না। অগত্যা তিনি সুনীতির মাতাকে কহিলেন, "আচ্ছা আজ থাক, তুমি যাও সুনীতিকে পরে আরও বুঝাইয়া তোমার নিকট রাখিয়া আসিব। মা ছেড়ে কি ও থাকতে পারে?" অগত্যা সুনীতির মাতা সুনীতিকে ছাড়িয়া একাকীই নূতন কার্য্যে যোগদান করিল। পাপিষ্ঠেরা তখন ভুবন মোহনে পবিত্র আত্মায় কলঙ্ক আরোপ করিতে লাগিল। তখন তিনি সুনীতিকে

নানা প্রকার বুঝাইয়া তাহার মাতার নিকট রাখিয়া আসিলেন। পাষণ্ড-গণ তখন তাহাদের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থের সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে তাহারা সুনীতির মাতাকে কহিল, "তোর মেয়ে আর বিয়ে দিয়ে কি করবি? একটা বাড়ী ক'রে দেওয়া যাক্ তোর মেয়ে যাতে সুখে থাকে তাই করা যাবে।" সুনীতির মাতা তাহাতে সম্মতা হইল না। তখন তাহারা বাজারের একজন বেশ্যার নিকট সুনীতিকে বিক্রয় করিলে বিস্তর টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে লোভ দেখাইল। সামান্যা চাকরাণী সেই বিপুল অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, সুনীতিকে বেশ্যার নিকট বিক্রয় করাই অবধারিত হইল।

এই কথা শুনিয়া সুনীতি বালা দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, তাহার বোধ হইল তাহার পায়ের নীচ হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কে তাহাকে এই নিদারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে,—কাহার শরণাপন্ন হইবে? সংসারে তাহার একমাত্র অবলম্বন জননী। আজ সেই জননীই তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যতা। তাহার অবস্থা আজ যূপকাষ্ঠ-বদ্ধ ছাগ শিশুর ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহাকে সহানুভুতি দেখাইবার জগতে কেহ নাই। যে মাতাকে সে এতদিন স্নেহময়ী দেবী মনে করিত, আজ তাহাকে দেখিলে সে কালনাগিনী মনে করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সে একবার মনে করিল পাপিষ্ঠের বাড়ী হইতে পলায়ন করিতে পারিলে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, কিন্তু তাহারও সুযোগ খুঁজিয়া পাইল না। চারিদিকে পাষণ্ডের চরগণ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। কিরূপে সে পলায়ন করিবে? আর পলাইলেই বা কে

তাহাকে আশ্রয় দিবে? এই সকল চিন্তা করিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তখন সে বিপদবারণ ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে লাগিল। তখন তাহার হৃদয়ে বসিয়া কে যেন তাহাকে ভুবন মোহনের শরণাপন্ন হইতে বলিয়া দিল, সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিল ঃ—

"বাবা! আজ বড় মর্ম্মাহত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। আপনি ছোট বেলা হইতে আমাকে পালন করিয়াছেন, তাই আপনাকে এই বিপদ-সময়ে প্রাণের দুঃখ জানাইতেছি। আমি এখানে আসিয়া অবধি আমার আহার নাই নিদ্রা নাই;—প্রতি মুহূর্ত্তে শশঙ্কিত প্রাণে, ব্যাঘ্রভীতা হরিণীর ন্যায় অতিশয় ব্যাকুল ভাবে অবস্থান করিতেছি। বাবা! বলিব কি, সে কথা আপনার কাছে কিরূপেই বা প্রকাশ করিব? তথাপি লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া, শুধু এই পাপ-কারাগার হইতে পরিত্রাণের জন্য, আপনাকে সেই কথা না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। মা, দুষ্ট লোকদের কুপরামর্শে ভুলিয়া, আমাকে পাপের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুনিতেছি এমনকি,—আমাকে বাজারে বেশ্যার কাছে বিক্রয় করিবেন। আপনি আমার পিতা ও মাতা, আপনি ছাড়া এ সংসারে আমার আর কেহ নাই। যদি ইহার কোন প্রতিবিধান বা আমার পরিত্রাণের উপায় থাকে তবে শীঘ্র করুন; নতুবা জানিবেন, আপনার স্নেহের সুনীতিকে আজই চিরদিনের জন্য এই পাপ সংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে। আমার এই শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন ইতি—

আপনার স্নেহের—

সুনীতি বালা।"

পত্রখানা লিখিয়া সুনীতি গোপনে একটী বালক দ্বারা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। ভুবন মোহন দিনাজপুর আসিয়া অবধি সর্ব্ব সাধারণের নিকট পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াই সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি পত্র খানি পড়িলেন। সুনীতি বালার দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল, দুই চক্ষে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি, তখন কিরূপে তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুনীতিকে, তাঁহার বাসায় আসিবার জন্য সংবাদ দিলেন। সে সংবাদে সুনীতি পরম আশ্বস্তা হইয়া, মায়ের নিকট হইতে পলায়ন করতঃ পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রয় লইল। তিনি তখন ষোড়শী সুনীতিকে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিয়া সপ্তাহ মধ্যে জলপাইগুড়ীর একটি ভদ্র লোকের সঙ্গে ব্রাহ্ম মতে তাহার বিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন।

পাষণ্ডগণের সংকল্প ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল, এবং ভুবন মোহনকেই তাহাদের এই সর্ব্বনাশের কারণ মনে করিয়া সুনীতির মাতাকে দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অবৈধ বিবাহের জন্য মনুষ্যহরণের অভিযোগ উত্থাপন করিল। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এই মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্তে আসিলেন। ভুবন মোহন আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ তাঁহাকে জানাইলেন সুনীতিবালার জবানবন্দীতেও তাঁহার উক্তি প্রমাণিত হইল, দিনাজপুরের তদানীন্তন জজ মিঃ কেলি পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা পড়িতেন, তিনি ও সহরের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ পণ্ডিত মহাশয়ের দেব-চরিত্র প্রমাণিত করিলেন। তদন্তে ষড়যন্ত্রকারীগণের নাম বাহির হইয়া পড়িল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বুঝিতে

পারিলেন, সুনীতির মাতা চক্রান্তকারীগণের ক্রীড়া-পুত্তলি মাত্র। তিনি ভুবন মোহনকে সসম্মানে মুক্তি দিয়া কহিলেন, "আপনি ষড়যন্ত্রকারীগণের প্রতিকূলে মান হানির মোকদ্দমা করিতে পারেন। আপনি মোকদ্দমা না করিলে আমি ইহাদের বিরুদ্ধে অন্য উপায় অবলম্বন করিব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ শুনিয়া ষড়যন্ত্রকারীগণ বিষম বিপদে পড়িল। তাহারা সাহেবের নিকট কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। তখন তাহারা দয়ার সাগর ভুবন মোহনের শরণাপন্ন হইল। তাহাদের করুণ ক্রন্দনে তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সম্মানের জন্য তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার এই অপূর্ব্ব ক্ষমার জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সুনীতি বালার ব্যাপারে বঙ্গের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ও দিনাজপুরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছিলেন, "শকুন্তলার কণ্ব মুনি আর সুনীতি বালার ভুবন মোহন।"

(২)

"ভুবন মোহন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দীক্ষিত নহেন, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথানুযায়ী কুক্কুটাদি ভক্ষণ করেন না। তিনি একাহারী নিরামিষ-ভোজী,—তাও আবার বৈষ্ণব-চূড়ামণি রায় সাহেব বাহাদুরের গোবিন্দ জী বিগ্রহের প্রসাদই তাঁহার একমাত্র আগ্রহের খাদ্য। এরূপাবস্থায় তাঁহাকে নিরাকার-সেবী ব্রাহ্ম না বলিয়া পৌত্তলিক হিন্দু বলাই সমী-

চিন। এরূপ পৌত্তলিককে ব্রাহ্ম-সভার আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিলে ব্রাহ্ম-সমাজের তথা নিরাকার ব্রাহ্ম-বাদের অবমাননা করা হয়।" এই মহাসত্য এতদিন পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা চসমার সাহায্যে আবিষ্কার করিলেন। একদিন তাঁহারা ব্রাহ্ম-সভায় এই বিষয় আলোচনা করিয়া ভুবন মোহনকে আচার্য্য পদের অযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিবামাত্র তিনি বেদি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সাগ্রহে বলিলেন, "আমি এই পদের প্রার্থী নহি, আপনারা আসুন, আমাকে অব্যাহতি দিন, আমি অনেক দিন হইতে অবসর লইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলাম আজ ভগবান্ সে সুযোগ মিলাইয়াছেন, আজ আমার বড় শুভদিন, তাই এমন সুযোগ মিলিল। আপনারা আমাকে এতদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাই আমি আপনাদের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আহারাদি সম্বন্ধে আপনারা আমাকে যে দোষ দিয়াছেন, তাহা খণ্ডাইবার সাধ্য আমার নাই, ভগবান্ আমাকে যে প্রবৃত্তি দিয়াছেন তদনুযায়ী আমাকে চলিতেই হইবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যার মূল; আমি প্রাণান্তেও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। রায় সাহেব বাহাদুরের গোবিন্দজীকে আমি ব্রহ্মের একটি কল্পিত রূপই মনে করি, এবং সেই ব্রহ্মের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। ভগবানের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা যেন আমরণ আমি সে প্রসাদে বঞ্চিত না হই।"

এই বলিয়া ভুবন মোহন বেদি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে অপর সভ্যগণ তাঁহাকে বেদি হইতে নামিতে বাঁধা দিয়া উল্লিখিত প্রস্তাবকারিগণকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন। কেহ কেহ বা উত্তেজিত

হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রাহ্ম-সভায় দারুণ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়া উঠিল, উভয় পক্ষের কোলাহলে সভাগৃহের চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া ভুবন মোহন তাড়াতাড়ি উভয় পক্ষের মধ্যে গিয়া বিবাদ নিবারণ জন্য উভয় পক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন গোলমাল থামিয়া গেল।

গোলমাল থামিয়া গেল বটে কিন্তু ভুবন মোহন আচার্য্য পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর বিরুদ্ধ পক্ষ তাহাদের প্রস্তাব অসঙ্গত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিল। আত্মাভিমানহীন ভুবন মোহন তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। তিনি আর আচার্য্য পদ পরিত্যাগ করিলেন না। ব্রাহ্ম সভা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

সর্ব্বজীবে সম দয়া।

(১)

একদিন ভুবন মোহন সহরের একজন জমিদারের বাটীতে চিকিৎসা করিতে যাইবেন। জমিদার মহাশয় বেলা অনুমান ডুইটার সময় ঘোড়ার গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে শকটবান ও অশ্ব ডুইটি ক্লান্ত হওয়ায় তাহাদের শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি শকটবানকে তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ পাকুড় বৃক্ষের ছায়ায় গাড়ী রাখিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। শকটবান তাহাই করিল। তিনি তখন একটি ছাতা লইয়া পদব্রজে জমিদার মহাশয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। জমিদার মহাশয় অত রৌদ্রে তিনি পদব্রজে গিয়াছেন দেখিয়া মনে করিলেন গাড়ী যায় নাই। তিনি কহিলেন, "আমি যে আপনাকে

আনার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছি, গাড়ী কি যায় নাই ?" তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "গাড়ী গিয়াছে, কিন্তু দেখিলাম গাড়োয়ান ও ঘোড়া দুইটি রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়াছে, তাই আমি তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দিয়া নিজেই হাটিয়া আসিলাম। আমি একাকী একটুকু কষ্ট স্বীকার করিলে যদি তিনটি জীবের ক্লেশের লাঘব হয় সেই জন্যই তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। জমিদার মহাশয় তাঁহার দয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

(২)

একদিন প্রাতে একজন ভক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে একহাড়ী রসগোল্লা আনিয়া দিল। পণ্ডিত মহাশয় নিজে যত্ন করিয়া হাড়ীটি রাখিয়া দিলেন, ভক্ত, পণ্ডিত মহাশয়ের ভবনেই আহার করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন, দুই প্রহরে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে একত্রে খাইতে বসিলেন, মনে করিয়াছিলেন এইবার রসগোল্লার হাড়ী খোলা হইবে। কিন্তু খাওয়া শেষ হইল, হাড়ী আর বাহির হইল না। আহারান্তে তাহার সহিত আলাপ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় হাড়ী লইয়া বাহির হইলেন। ভক্তও পাছে পাছে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি কুলি পাড়ায় প্রবেশ করিয়া কুলি বালক-বালিকাগণকে ডাকিয়া সেই রসগোল্লা বিতরণ করিতে লাগিলেন। ভক্ত অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। যাঁহাকে সে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে,—যে দেবতার সেবার জন্য সে কত যত্নে রসগোল্লাগুলি আনিয়াছিল, তাহার একটিও সে দেবতা গ্রহণ করিলেন না। তাহার সেই ভক্ত্যুপহার কুলিবালকবালিকাগণ ভোজন করিল,—যজ্ঞের ঘৃত কুকুরে খাইল দেখিয়া তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন, "আমি আপনার জন্য অতি যত্নে এই

মিঠাই আনিয়াছিলাম, আপনি তাহার একটিও খাইলেন না।" ইহা শুনিয়া ভুবন মোহন কহিলেন,—"বাবা! আপনি দুঃখিত হইবেন না। ইহারা খাইলেই আমার খাওয়া হইল। আমি এ জীবনে অনেক মিঠাই খাইয়াছি,—ইহারা কখনও খায় নাই। ইহাদের পিতা মাতা গরীব, মিঠাই কিনিয়া দিবার সাধ্য তাহাদের নাই। ইহারা মিঠাই খাইয়া যেরূপ সুখী হইল আমি সেরূপ হইতাম না। ইহারা এই উপাদেয় মিঠাই খাইয়া যে আনন্দলাভ করিল আমি তাহাতেই খাওয়া অপেক্ষা অধিকতর পরিতোষ লাভ করিলাম। বাবা! শৃগাল কুকুর প্রভৃতি পশুরাই নিজে খাইয়া সুখী হয়;—মানুষ তাহা পারে না। মানুষের আত্মা পরকে খাওয়াইয়াই সুখী। আমি ভরসা করি আপনার ভালবাসার জিনিস, পর সেবার নিয়োজিত হইল বলিয়া আপনি সুখী হইবেন এবং আপনার অর্থ ব্যয়ও সার্থক মনে করিবেন।" এই কথা শুনিয়া ভক্ত অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি ইনি সত্য সত্যই দেবতা!

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভুবন মোহন দিনাজপুরে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য আত্ম-নিয়োগ করিলেও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান বিষয়ে বা কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও অবহেলা করেন নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষাদান-প্রণালীর জন্য তিনি অচিরকাল মধ্যেই ছাত্রগণেরও কর্ত্তৃপক্ষের ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। তাঁহার গুণগরিমা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

মহর্ষি ভুবন মোহন

দিনাজপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার অগাধ সংস্কৃত জ্ঞানের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষী হইলেন। এবং তাঁহাকে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে তাঁহার বাসা প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী। রাস্তাও জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই, মহারাজা বাহাদুর তাঁহার যাতায়াতের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু তিনি সেরূপ ইচ্ছা কখনও করেন নাই। তিনি বলিতেন গাড়ীতে বেড়াইলে তাঁহার শরীর শিথিল হইয়া যাইবে, আর তিনি দরিদ্র সেবা করিতে পারিবেন না।

রাজবাড়ী হইতে প্রায় রাত্রি দশটার সময় সেই জঙ্গলাকীর্ণ পথে বাসায় ফিরিতে কতদিন কত বাঘের সম্মুখে পড়িয়াছেন। একদিন বাঘে তাঁহাকে তাড়াও করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ভবভয়হারী ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করতঃ জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই রূপে প্রায় চারি বৎসর কাল তিনি মহারাজা বাহাদুরকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়াছিলেন। সূক্ষ্মদর্শী মহারাজা বাহাদুর তাঁহার অগাধ সংস্কৃত জ্ঞান, অতুলনীয় শিক্ষাদান-প্রণালী, সচ্চরিত্রতা ও সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। মহারাজা বাহাদুর পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ভুবন মোহনের অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। তাঁহাকে তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। মহারাজা বাহাদুর যখন শঙ্কটাপন্ন কাতর অবস্থায় জন্মের মত কলিকাতায় যাত্রা করেন, তখন জুলুম সাগর-প্রাসাদে ভুবন মোহন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। মহারাজা বাহাদুর বালকের ন্যায় ভুবন মোহনের পা দুখানি

জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! চলিলাম,—এই আমার শেষ যাত্রা, এ সময়ে দেবতার পদধূলি লাভে আমি চরিতার্থ হইলাম।" ভুবন মোহন তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া বাসায় ফিরিলেন।

রাজপ্রাসাদের অদূরে রাজারামপুর গ্রামে স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় বাস করিতেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানী হইলেও মহামহোপাধ্যায় উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত হয়েন নাই; অথবা তাহা লাভের জন্যও তিনি কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত অনেক "সম্রাট" ও "রাজা"র আসন কম্পিত হইত। দুর্ভাগ্য বশতঃ এহেন পণ্ডিতরত্ন দৃষ্টি-শক্তি-হীন হইয়াছিলেন। ভুবন মোহন তাঁহার নিকট গিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। মহারাজা বাহাদুরের শিক্ষা-সমাপ্তির পর প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পরই তিনি তথায় যাইতেন। ভুবন মোহনের অসীম শাস্ত্রানুরাগ ও ভগবৎ প্রেমের পরিচয় পাইয়া তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। অনেক সময় গাড়ী করিয়া তিনিও ভুবন মোহনের আলয়ে আসিতেন।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বাড়ী, ভুবন মোহনের বাসা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে। রাস্তা অধিকতর জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল। ভুবন মোহন সন্ধ্যার পর তথায় গিয়া অধিক রাত্রে বাসায় ফিরিতে কতবার বাঘের সম্মুখে পড়িয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহাতেও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট যাইতে বিরত হন নাই। তিনি শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মচর্চ্চাপেক্ষা জীবনকে তুচ্ছ মনে করিতেন। একদিন অধিক রাত্রে বাসায় ফিরিতে-ছেন, পথিমধ্যে দেখিলেন অনতিদূরে একটি অগ্নিগোলক তাঁহার দিকেই আসিতেছে, পরক্ষণেই দেখিলেন, অগ্নি নিবিয়া গেল। আবার একটু

পরেই দেখিলেন পুনরায় সে গোলক রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের দিক অগ্রসর হইল, আবার নিবিল আবার জ্বলিল। তিনি এই অভূতপূর্ব্ব অগ্নিগোলক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন একি? তবে লোকে যে ভূতের গল্প করে তাহা কি সত্য? একি সেই ভূত? ভুবন মোহনের নির্ভিক হৃদয় ক্ষণেকের জন্য দমিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কারণানুসন্ধানের জন্য তাঁহার হৃদয়ে বলসঞ্চার হইল। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে কারণানুসন্ধান না করিয়া ছাড়িতেন না। ভূতভাবন ভগবানেব নাম স্মরণ করিয়া তিনি ইহার কারণ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইলেন। এবং দ্রুতপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই দেখিলেন এক যুবতী একটি ধূপতি লইয়া যাইতেছে। সে যখন ধূপতির আগুনে ধূনা দিতেছে তখনই আগুন জ্বলিতেছে, আবার ধূনা পুড়িয়া গেলেই, অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইতেছে। তিনি যুবতীর সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "মা! আপনি কে? কেন এত রাত্রে এই নির্জ্জন ভয়াবহ পথে এমন করিয়া বেড়াইতেছেন?" যুবতী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "আমি একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর ঘরের বাল বিধবা। আমার কোন আত্মীয় পীড়িত, দিনের বেলা যাইতে পারি না, তাই রাত্রে তাহাকে দেখিতে চলিয়াছি। কোন লোক আমাকে দূর হইতে দেখিলেই ভয়ে পলাইবে এবং আমিও আগুনের আলোকে নিজ পথ দেখিয়া লইতে পারিব মনে করিয়া এইরূপ ভাবে চলিয়াছি।" রমণীর কথায় ভুবন মোহন অবাক্ হইলেন এবং "তবে যাও মা" বলিয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

তাঁহার অসাধারণ ভাষা-জ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর কথা ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণও জানিতে পারিয়াছিলেন। দিনাজপুরের তদানীন্তন

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেমন তাঁহার নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালী ও সাধুতায় সাহেব তাঁহাকে যার পর নাই ভক্তি করিতেন। কয়েক বৎসর পর, তিনি, রাজসাহী বিভাগের কমিশনার হইয়া, যখন দিনাজপুর পরিদর্শনে আইসেন, তখন ভুবন মোহন মডেল স্কুলের শিক্ষক। সাহেব মডেল স্কুলের দ্বার দেশে গিয়া তাহার বঙ্গভাষার গুরু ভুবন মোহনকে ভক্তিভরে করযোড়ে নমস্কার করিয়া স্কুল পরিদর্শন করিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কত পান?"

ভুবন। চল্লিশ টাকা।

সাহেব। তাহাতে আপনার চলে?

ভুবন মোহন বলিলেন, "ইহাতেই আমার বেশ চলিতেছে বরং আবশ্যক খরচ করিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত হয়।" সাহেব শুনিয়া অবাক হইলেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি অতি সামান্য ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সামান্য শাকশব্জী ডাল এবং মোটা চাউলের ভাতই তাঁহার উপাদেয় খাদ্য ছিল। সামান্য একখানা মোটা থানের কাপড় পরিতেন ও মোটা চাদর গায়ে দিতেন। পায়ে একজোড়া সাধারণ চটি ব্যবহার করিতেন। শীতকাল ভিন্ন জামা ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "আমি বারো আনার ধুতি পরিলেও যাহা থাকিব পাঁচ টাকার ধুতি পরিলেও তাহাই থাকিব। সুতরাং পোষাকের জন্য বেশী ব্যয় করিয়া ফল কি? বরং তাহাদ্বারা দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিলে তাহাদের উপকার হয়।" কেহ কোন মূল্যবান বস্ত্রাদি তাঁহাকে দিলে, তিনি হয়ত তাহা কোন দরিদ্রকে দিতেন—নতুবা তাহা বিক্রয় করিয়া

তন্মূল্যে ঔষধ আনিয়া বিতরণ করিতেন। তিনি দেড় হাত চওড়া একখানা ছোট চৌকিতে একখানা কাপড় পাড়িয়া শয়ন করিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহাকে ভাল চৌকিতে ভাল বিছানায় শুইতে বলিতেন কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইতেন না। একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র যোগেন্দ্রনাথ মনে করিলেন তাঁহার সেই প্রিয় চৌকিখানির অস্তিত্ব লোপ না করিলে আর তাঁহাকে ভাল চৌকিতে শোয়ান যাইবেনা। তিনি ভুবন মোহনের অনুপস্থিতি কালে সেই চৌকিখানি ভাঙ্গিয়া একেবারে পোড়াইয়া ফেলিলেন এবং একখানি বড় চৌকি আনিয়া সেস্থানে রাখিয়া দিলেন। ভুবন মোহন ঘরে গিয়া তাঁহার সেই চৌকি নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র বলিলেন, "আপনার সেই চৌকিখানা পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে,—আপনি এই চৌকিতে শয়ন করুন। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "আমার দিনাজপুর আসার স্মৃতি তোমরা লোপ করিয়াছ ; এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমি দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছি, দারিদ্র্যই আমার বরণীয়, বিলাসিতা আমার পরম শত্রু। আমার চৌকি গিয়াছে আমি মাটিতেই শুইব।" এই বলিয়া তিনি মাটিতেই শয়ন করিতে উদ্যত হইলেন ; তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জগদীশ চন্দ্র কহিলেন, আপনি এই বিছানায় না শুইলে বাসার সমুদায় চৌকি ও বিছানা পোড়াইয়া সকলেই মাটিতে শুইব।" এই কথা শুনিয়া অগত্যা ভুবন মোহন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বিছানায় শয়ন করিলেন।

দিনাজপুরের তদানীন্তন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নোলেন তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। তিনিও তাঁহাকে যারপর নাই ভক্তি করিতেন।

কয়েক বৎসর পর তিনি রাজসাহী বিভাগের কমিশনার হইয়া দিনাজপুর পরিদর্শনে আইসেন; তখন ভুবন মোহন মডেল স্কুলের শিক্ষক। সাহেব স্কুল পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষকের উন্নতির জন্য তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি, স্কুল-সব-ইনস্পেক্টার-পদ আপাততঃ গ্রহণ করুন, পরে আপনাকে ডিপুটী ইনস্পেক্টার পদে উন্নীত করা যাইবে।" ভুবন মোহন দেখিলেন পদোন্নতি লাভ করিলে তিনি হয়ত অর্থের মোহে মুগ্ধ হইয়া পরমার্থ ভুলিয়া যাইবেন, তাই তিনি সাহেবকে বলিলেন, "আমি যাহা পাইতেছি তাহাতেই আমার বেশ চলিতেছে, আমি আর পদোন্নতি প্রার্থনা করি না।" সাহেব ভুবন মোহনের স্বার্থত্যাগে বিস্মিত হইলেন।

ভুবন মোহন জেলা স্কুলে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন পাইতেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জেলা স্কুল হইতে সংস্কৃত-শিক্ষা উঠিয়া যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে দিনাজপুর মডেল মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য করিয়াও, মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। বেতনের টাকা হইতে মাসিক পাঁচ টাকা মাতাকে, পাঁচ টাকা বিধবা ভ্রাতৃবধূকে, পাঁচ টাকা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়চন্দ্রকে ও পাঁচ টাকা বিধবা ভগিনীকে দিতেন। বক্রী কুড়ি টাকা দ্বারা নিজের ভরণ পোষণ ও দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। গৃহ-শিক্ষকতার টাকা দ্বারা পুস্তকাদি ক্রয় করিতেন ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনাইয়া বিতরণ করিতেন।

তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্য, কার্য্যকুশলতা ও পাণ্ডিত্যে কর্তৃপক্ষ

তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, ১৮৭৪ এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজসাহী বিভাগের মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষায় সাহিত্য ও অঙ্কের পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্বর্গীয় ৺ভূদেব বাবু তাঁহার স্কুল পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ মহাত্মা মিঃ কেলী ভুবন মোহনের নিকট বাঙ্গালা-ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি পরম পুণ্যাত্মা ও দয়াবান্ ছিলেন, প্রাণান্তে ও কাহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে চাইতেন না। একবার একজন নরহন্তা, তাঁহার নিকট মুক্ত কণ্ঠে হত্যা করা স্বীকার করিল, তিনি তাহাকে তাঁহার নিকট স্বীকারোক্তির বিষময় ফল বিশদ রূপে বুঝাইলেন, উকিলগণও বুঝাইলেন,—কিন্তু সে কিছুতেই স্বীয় অপরাধ অস্বীকার করিল না, অগত্যা আইনের অনুরোধে তিনি তাহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি অনেক দরিদ্র বালকের পড়ার সাহায্য করিতেন। এহেন মহাত্মার সহিত মহাপ্রাণ ভুবন মোহনের বিশেষ সদ্ভাব জন্মিল। উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া কত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। জজ সাহেবের নিকট বাইবেলের উপদেশ শুনিয়া তাঁহার বাইবেল পড়িতে আগ্রহ জন্মিল। জজ সাহেব তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অতি অল্প দিনেই তিনি ইংরাজী শিখিয়া তাঁহার নিকট বাইবেল পড়িতে আরম্ভ করেন। সেই হইতে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই মার্চ্চ তারিখে, সপ্তাহে সোম, বুধ ও শুক্রবার স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথের জামাতা, দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তদানীন্তন একাউণ্টাণ্ট, বাবু নিমাই চরণ ঘোষের নিকট লেনিস্

গ্রামারের syntax পড়িতেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জননী রাসমণি দেবী পরলোক গমন করিলে, তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি জীবনে আর কাহারও মৃত্যুতে তেমন অধীর হন নাই। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে তিনি ছুটি লইয়া কলিকাতা গেলেন, তথায় পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তটে বিস্তর দরিদ্রকে ভোজন করাইয়া মাতার স্বর্গার্থে যথেষ্ট দান করিলেন। দিনাজপুর আসিয়াও সেইরূপ দরিদ্র ভোজন করাইয়া দান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আনন্দচন্দ্র তাঁহাকে এই কার্য্যে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জননীর স্বর্গার্থে প্রত্যহ উপাসনা করিতেন।

তিনি অতঃপর রায় সাহেব বাহাদুরের কুমারদ্বয়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরম বৈষ্ণব রায় সাহেব বাহাদুর তাঁহার অসীম ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই যার পর নাই শ্রদ্ধা করিতেন এক্ষণে তাঁহার অধ্যাপনা নৈপুণ্য দর্শনে তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে তিনি দিনাজপুর-কায়স্থ-সভায় কিছুদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

দিনাজপুরের অন্যতমা ভূম্যধিকারিণী হরিপুরের শরৎসুন্দরী চৌধুরাণীও তাঁহার নিকট কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তিনি হরিপুরের জমীদার গণের উকিল ছিলেন। জমিদারগণ তাঁহার নিকট অনেক টাকা পাইবেন বলিয়া দাবী করিলেন। তখন তাঁহার অন্য ভগিনীপতি বাবু ঈশান

চন্দ্র ঘোষ, ঠাকুরগাঁয় মোক্তারী করিতেন। ঈশান বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জমিদার মহাশয়গণের সহিত ৺আনন্দ চন্দ্রের হিসাব মীমাংসা করিতে গেলেন, কিন্তু হিসাবে নানারূপ গোলযোগ বাধিল। তখন ভুবন মোহন নিজেই হরিপুর গেলেন। জমিদারগণ এক সভা আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। হিন্দু-ধর্ম্মের একনিষ্ট সেবক হরিপুরের জমিদারবৃন্দ ব্রাহ্ম-চার্য্যের হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত বক্তৃতায় বিমোহিত হইয়া গেলেন। হিসাবের সমুদয় গোলমাল মিটিয়া গেল, তাঁহাদের আর এক কপর্দ্দকও পাওনা হইল না; অধিকন্তু তাঁহারা তাঁহার পাথেয় পর্য্যন্ত বহন করিলেন।

ভুবন মোহন সংসারে থাকিয়াও, কখনও স্নেহ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া আত্মীয় স্বজনের স্বার্থের জন্য ন্যায় পথ পরিত্যাগ করেন নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাদবচন্দ্রকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়চন্দ্রের সহিত যাদবচন্দ্রের মনোমালিন্য হইলে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথক্ হইয়া বালুবাড়ীতে পৃথক্ বাসা করেন। যে স্থানে তিনি বাসা করিলেন ঐ স্থানে পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সভা ছিল। তাঁহার বাড়ী করার অনেক পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসভা গণেশ তলায় স্থানান্তরিত হওয়ায় স্থানটি শূন্য পড়িয়াছিল। যাদবচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন ঐ স্থান যখন মহারাজা বাহাদুর, ভুবন মোহনকে দান করিয়াছেন তখন তাহাতে আর তাঁহার কোন স্বত্ব নাই। ভুবন মোহনই তাহার মালিক, যাদব চন্দ্র এই স্থানে বাসা প্রস্তুত করার জন্য ভুবন মোহনের অনুমতি চাহি-লেন। ভুবন মোহন কহিলেন, "মহারাজা বাহাদুর ব্রাহ্ম-সভার জন্য

ঐ স্থান আমাকে দিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সভা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং ঐ স্থান এক্ষণে আর ব্রাহ্ম-সভা বা তাঁহার নাই, মহারাজা বাহাদুরই উহার এক্ষণে প্রকৃত মালিক। অতএব তুমি তাঁহার নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লও।" তখন দিনাজপুর সহরে জমি এখনকার মত মহার্ঘ ছিল না। দিনাজপুরাধিপতির উদারতাও যথেষ্ট ছিল, বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া, পরে গিয়া বন্দোবস্ত করিলেও কোন ক্ষতি হইত না। যাদব চন্দ্র তাহাই করিলেন এবং মহারাজা বাহাদুরের নিকট হইতে স্থানটুকু পত্তন হইলেন। মহারাজা বাহাদুর এই ব্যাপারে ভুবন মোহনের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

এই সময় তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই "উদ্বোধন" শীর্ষক উপদেশ গুলি আমরা নিম্নে পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"উদ্বোধন।"

১। ঈশ্বর লাভই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

২। তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস, উপভোগ, মানব জীবনের চরম ফল।

৩। উৎসব হৃদয়ের সঞ্জীবন মহৌষধ।

৪। মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত হৃদয়কে প্রেমালিঙ্গনে উদ্বুদ্ধ বা জাগরিত করিতে উৎসবের ন্যায় আর দ্বিতীয় নাই।

৫। অসুরেরা সময়েই বল পায়। যতই লোক আসুরিক প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিবে, ততই সে তাহাকে পরাভব করিবার শক্তি পাইবে।

৬। চির জীবন সুহৃদ, চির জীবন সহচর তুমি। যে মানব মর্ত্ত্য-জগতে থাকিয়া তোমার সহিত সখ্য-সৌহৃদ্যভাব সংস্থাপন করিতে পারেন তিনিই ধন্য,—তিনি সার্থক-জন্মা,—তাহারই মানব-জনম ধারণ, সার্থক হইয়াছে।

৭। তুমি পুরাতন, অথচ তোমার ন্যায় নূতন আর কেহ নাই। যদিও তুমি পুরাতন, তথাপি যখনই তোমার দিকে তাকাই, তখনই নূতন ভাবে দেখিতে পাই।

৮। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিজন্য উদার বা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত?

(ক) ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে পরিমিততা ও সঙ্কীর্ণতা-হীনতা।

(খ) যে ধর্ম্মে যেখানে যে কোন সত্য পাইবেন তাহাই আদরে গ্রহণ করিবেন।

(গ) ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে জাতি বিশেষকে আদর করে না।

(ঘ) ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের গুরু সেই জগদ্‌গুরু,—পরম গুরু—কেন না তিনি জানেন যে মানব সহস্র জ্ঞানে জ্ঞানী হইলেও, তাহার জ্ঞানের সীমা আছে। কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞানের বারিধি, তাঁহাতে জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয়।

৯। আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং তমোচ্যতে।

শব্দ ব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥

যে জ্ঞান ঈশ্বরের পথ প্রদর্শক, সেই জ্ঞানকেই ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলে। এই ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান দ্বিবিধ, আগমোত্থ ও বিবেকোত্থ।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপদেশ-বিশেষ দ্বারা যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার

নাম আগম-জনিত জ্ঞান। আর ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহার নাম বিবেক-জনিত জ্ঞান। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলেই বিবেকের উদয় হয়, এবং বিবেক দ্বারাই পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়। আত্মার উদ্বোধনের জন্যই কীর্ত্তন ধ্যানাদির প্রয়োজন।

নারদ পুরাণে প্রহ্লাদ বাক্যং—

জপতো হরি নামানি শ্রুতং শত গুণাধিকম্।
আত্মানাঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄ্ণ পুনাতিচ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো শরণং পাদ সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তি মান শূন্যতা।
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে সদারুচিঃ॥
আসক্তি গুস্তনাখ্যানে প্রীতি স্তদ্বসতি স্থলে।
ইত্যাদয়োঽণু ভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥

ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায় গুণসাগর বলিয়াছেন, "সঙ্গীতের অপরাজিতা শক্তি, যাবতীয় প্রধান শক্তিকে পরাজিত করিয়াছে। বক্তার বক্তৃতা-শক্তি, কবির কবিত্ব-শক্তি, তার্কিকের তর্ক-শক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তিকেই সঙ্গীতের অলৌকিক শক্তি পরাভব করিয়াছে। সঙ্গীতের মনোমোহিনী শক্তিতে ভূধর হইতে ভূগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীজগৎ মোহিত। যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিখ্যাত সেই মহাকবি সেকস্‌পিয়রও সাতিশয় সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। মহাকবি মিণ্টন ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি লব কুশকে রামগান শিক্ষা দিয়া রামচন্দ্রকে মোহিত

করিয়াছিলেন। মহাকবি হোমার গান গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন। রামপ্রসাদ, জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সঙ্গীতে দেশ মোহিত করিয়াছিলেন।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস বিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নাম নামিনোঃ।
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥
অহঙ্কার বিমুক্তানাং কেশবো নহি দূরগঃ।
অহঙ্কার যুতানাঞ্চ মধ্যে পর্ব্বত কোটয়ঃ ॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
নমেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন,
যমেবৈধ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলং তু বহুশ্রুতঃ,
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্ব্বীসূপ রসানিব।
যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥
ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্ম বিগুণম্।
তৎসর্ব্ব পাতকং হন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখ সাগরেঽস্মিন্‌লীনং পরে ব্রহ্মনি যস্য চেতঃ ॥
এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনে ঽপ্যণুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥

ধর্ম্মেনৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধরেকঃ।
ধর্ম্মাদ্ বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈনমঃ॥
ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা।
ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টাঃ মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ।
গায়ন্তো গায়সীং গাথাং পুলকাঙ্কিত-বিগ্রহাঃ॥
অস্মৎ কুলে কুল শ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়া পিণ্ডৈঃ কিং তীর্থ শ্রাদ্ধ তর্পণৈঃ॥
উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবোস্তু মধ্যমঃ।
জপস্তত্যধমো ভাবো বাহ্য পূজা ধমাধমা॥"

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভুবন মোহন, তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের সময় বৃদ্ধির মানসে, ইতঃপূর্ব্বেই গৃহশিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন স্কুলের চাকুরীটিও পরিত্যাগ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া, অবসর লাভের জন্য আবেদন করিলেন। অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার কিরূপে চলিবে তাহা একবারও চিন্তা করিলেন না। তাহা তিনি করিতেন না। তিনি বলিতেন,—

"ধর্ম্মংহি চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ আহারং নৈব চিন্তয়েৎ।
আহারোহি মনুষ্যানাং জন্মনা সহ জায়তে॥"

"নিশ্চিন্ত বৈরাগী ঈশা, সকল বিষয়ের জন্যই, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতেন। এইজন্য তিনি বলিতেন, "আমি বলিতেছি, কি আহার

করিব, অথবা কি পরিধান করিব বলিয়া ভাবিও না, কেন না তোমা-দের যে সকল অভাব আছে, তাহা তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন। ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কল্যকার নিমিত্ত ভাবিও না।

তিনি অবসর প্রাপ্তির আবেদন করিলেন, তদানীন্তন বিভাগীয় ইনস্পেক্টার, তাঁহার ন্যায় একজন প্রবীন শিক্ষককে সহসা পরিত্যাগ করিতে কুন্ঠিত হইলেন। তিনি ভুবন মোহনকে আরও কিছুদিন, অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভুবন মোহন যে ধর্ম্মের ডাকে ছুটিয়াছেন, তিনি ইনস্পেক্টার সাহেবের নিষেধ শুনিবেন কেন? যাঁহার ডাকে রূপ-সনাতন একদিন বঙ্গেশ্বর সায়েস্তা খাঁর কঠোর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ভুবন মোহন আজ তাঁহারই ডাক শুনিয়াছেন, সুতরাং তিনি সাহেবের অনুরোধ শুনিলেন না। তিনি কহিলেন "আমি এতদিন আপনাদের সেবা করিলাম, এক্ষণে দয়া করিয়া আমাকে অবসর দিন, আমি একবার ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করি।" ইনস্পেক্টার মহোদয় আর কথা কহিলেন না, তিনি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া মাসিক কুড়ি টাকা তাঁহার অবসর বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সেবা ব্রত।

ভুবন মোহন বলিতেন, "জগতের নর-নারীগণ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন নহে, তাহারাও পরব্রহ্মেরই অংশ। যেমন হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিই শরীর, সেইরূপ সমস্ত আত্মার সমষ্টিই ব্রহ্ম। ইহার একটি বাদ

দিলে, অপরটি অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। অঙ্গহীন উপাসনায় তাঁহার প্রীতি হইতে পারেন না। সেই ব্রহ্মকে যেমন সত্য স্বরূপ জানিয়া,—তাঁহাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া,—আপনার আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সুহৃদ মনে করিয়া, তাঁহাকে প্রাণের প্রীতি দিয়া পূজা করিতে হইবে, সেইরূপ তাহারা প্রিয় সন্তান নর-নারীগণকে, ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের কল্যাণসাধনে তৎপর থাকিতে হইবে। আপনার মধ্যে আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিয়া বিশ্বাত্মা রূপে আরাধনা, এবং কল্যাণকর কার্য্য দ্বারা জগতের নরনারীগণের প্রীতি ও পরিতোষ সম্পাদন করা উভয়ই সাধনার অঙ্গ। ইহার একটি বাদ দিলে উপাসনা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বদাই পরমাত্মা জীবাত্মাকে উপদেশ দিতেছেন। জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার উক্তি লইয়াই বেদ-উপনিষদ। আত্মাই অনন্ত বেদময়,—তাঁহার বাণী বেদ-স্বরূপ। মন বাহ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকিলে, আত্মা চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠে। অস্থির আত্মার সেই বাণী উপলব্ধি করা যায় না। বিক্ষিপ্ত মনকে বাহ্যবিষয় হইতে সংহৃত করিয়া, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় এবং ঐকান্তিক চিত্তে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে সেই বাণী শ্রুত হওয়া যায়। তখন আত্মাও ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। দেবহুতি-তনয় মহর্ষি কপিল একজন সিদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মভাবস্থ হইয়া মাতাকে উপদেশ দিতেছেন, আমি একমাত্র পরমব্রহ্ম পরমাত্মা হইয়াও সর্ব্বদা সকল ভূতে জীবাত্মা রূপে অবস্থান করিতেছি। সেই জীবকে অবজ্ঞা করিয়া যে পরব্রহ্মের অর্চ্চনা করে, তাহার সে অর্চ্চনা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত জীবাত্মারূপে আমাকে দান, যান, মিত্রতা ও সর্ব্বত্র সম

দ্বারা আপ্যায়ন করিবে। সুতরাং ব্রহ্ম-উপাসনার দুইটি অঙ্গ,—জীব ও ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মই ব্যষ্টি ভাবে জীব, এবং সমষ্টি ভাবে ব্রহ্ম।

"সত্যং জ্ঞানমনন্ত মেকমেবা দ্বিতীয়ং।

সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। সকল আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে যেমন আপনার আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে জানিবার চেষ্টা করিবে,—স্তুতি, কীর্ত্তন প্রার্থনাদি দ্বারা সর্ব্বোতভাবে তাঁহার পূজা করিবে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহীদিগের মধ্যে অবস্থিত জীব-নিকরকেও দয়া মৈত্রী, সেবা ও কল্যাণকর কার্য্য দ্বারা তাহাদের প্রীতি সাধন করিবে। আত্মার তুষ্টিতেই ভগবানের তুষ্টি। দয়া পরোপকারাদি জীবহিতকর কার্য্য দ্বারা আত্মার যেমন তুষ্টি হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। যিনি এক দিনও স্বীয় শক্তি দ্বারা ক্ষুধিতের ক্ষুধা, তৃষিতের তৃষ্ণা ও দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছেন, তিনি ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন। সংসারে আত্মার তৃপ্তি-কর যদি আর কিছু থাকে তবে পরসেবা বা পরহিত-সাধনকেই নির্দ্দেশ করিতে হয়। যাহা জগতের কল্যাণকর, আত্ম-তৃপ্তি ও ভগবৎপ্রীতির সাধক তাহাই ধর্ম্ম। দয়া দ্বারা সেই জগতের কল্যাণ, আত্মপ্রীতি ও ভগবৎপ্রীতি সম্পাদিত হয়। এইজন্য মহাযোগী মহাদেব উপদেশ দিয়াছেন,—"দয়াই সকল ধর্ম্মের মূল, সর্ব্ব প্রযত্নে সেই দয়া-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।" তাই ভুবন মোহন পরসেবাও ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া মনে করিতেন, এবং সেই পরসেবার জন্য পোর্জ্জনা থাকা কালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পোর্জ্জ-নার সঙ্গে তাঁহার সেবাব্রতের উপকরণ হোমিওপ্যাথিকের বাক্সটি

পরিত্যাগ করিয়া আইসেন নাই। তিনি দিনাজপুর আসিয়া দেখিলেন এখানে কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নাই। এলোপ্যাথিক ও কবিরাজী চিকিৎসাই এখানে প্রচলিত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই মানবের একমাত্র উপযোগী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি জগতের হিতের জন্য তাহা প্রচার করাও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মও রাম মোহনের ধর্ম্ম নহে, হোমিওপ্যাথিকও হানিমানের চিকিৎসা নহে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূলতত্ব ও "সদৃশ-বিধান-তত্ব" দুইটিই ভগবানের মহাসত্য। শতসহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে, গিরিগুহাবাসী পর্ণফলমূলাশী আর্য্য ঋষিগণের জীবন-ব্যাপিনী সাধনার ফলে এই মহাসত্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

"এক মেবাদ্বিতীয়ম্"

উপলব্ধি করিয়া তাহারাই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা—পরম ব্রহ্মের আরাধনা বা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং

"বিষস্য বিষমৌষধং"

হোমিওপ্যাথির মূলতত্ব,—এই সদৃশ-বিধান-তত্ব এককালে তাহাদিগ-দ্বারাই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কাল ক্রমে আর্য্যগণের তপোবল বা সাধনার গতি যতই মন্দীভূত হইতে লাগিল, এই দুইটি মহাসত্যও ততই বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সেই লুপ্তপ্রায় মহাসত্যই সত্যস্বরূপ ভগবানের ইচ্ছায় জগতের কল্যাণের জন্য মহাত্মা রাম মোহন রায় ও মহাত্মা হানিমান দ্বারা পুনরায় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, যেমন মাতাপিতা সন্তানের কল্যাণের জন্য সময় সময় আদেশ

উপদেশ প্রদান করেন। বিশ্বপিতাও সেইরূপ তাহার জগৎ সন্তানের কল্যাণের জন্য মহাপুরুষগণের মধ্য দিয়া তাহার মঙ্গলাদেশ প্রচার করেন। মানব মাত্রেরই তাহা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

'তস্মিন প্রীতিস্তৎ প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব' এই নব বিজ্ঞানের যুগে, বিজ্ঞানের মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত এই নব বিধানের গ্রহণ ও প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য। সত্য স্বপ্রকাশ, তাহা কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তথাপি আমার এই ক্ষুদ্রশক্তিদ্বারা, তাঁহার সেই মঙ্গলাদেশ যতটুকু পালন করিতে পারি তাহাতে ত্রুটি করিব না, কারণ জগতের মঙ্গলের জন্য ইহা মঙ্গলময় বিধাতার মহাদান। তাঁহার প্রদত্ত ধন, তাহার সন্তানগণকে বিলাইব ইহাতে আমার গৌরবের লাঘব কি? এই মঙ্গল বিধানের যতই প্রচার হইবে ততই জগতের মঙ্গল। পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট, সদাচার-ভ্রষ্ট, সংসার-নিষ্পেষিত, ও সমাজ-তাড়িত দুঃস্থ নর-নারীগণের মানসিক ব্যাধি নিরাকরণের একমাত্র সহজ সুগম পন্থা যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, সেইরূপ দুঃখ-দারিদ্র্য-নিপীড়িত ও অশেষ ব্যাধি জর্জ্জরিত নর-নারীগণের দৈহিক ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভের সহজ অথচ অল্প ব্যয়-সাধ্য হোমিওপ্যাথি একমাত্র মহৌষধ। রাশি রাশি শাস্ত্র আলোড়ন ও অধ্যয়ন করিয়া এবং যাগ যজ্ঞ তপশ্চর্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াও যে ভব-ব্যাধির উন্মূলন করা যায় না, তাহা যেমন এক হরি নামে সাধিত হইতে পারে সেই প্রকার গণ্ডায় গণ্ডায় গুলি ও বোতলে বোতলে রাশি রাশি ঔষধ সেবন করিয়া যে ফল পাওয়া যায় না তাহা সুনির্ব্বাচিত হোমিওপ্যাথির একটী মাত্র অনুবটিকাতেই পাওয়া যাইতে পারে।

ভক্তাবতার দেবর্ষি নারদ যেরূপ ভৈরব হুঙ্কারে ঘোষণা করিয়া জগতকে জানাইয়াছেন,

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।"

"কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেবগতিরন্যথা।"

সেইরূপ বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া হানিমানও হোমিওপ্যাথিক প্রচার করিয়া বলিয়াছেন,—"রাশি রাশি ঔষধ সেবন করিয়া নাড়ী বিদাহিত করিবার প্রয়োজন নাই,—হোমিওপ্যাথিক একটি ফোঁটা বা একটি বটিকাই অশেষ রোগ নির্ম্মূল কারক।"

"সত্যমেব জয়তে"

সত্যেরই জয় হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার এবং হোমিওপ্যাথি সকল চিকিৎসার সার-বিধান বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে জগতের সর্ব্বত্র সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। অল্পায়াস ও অল্পব্যয় সাধ্য দুইটী বিধানই এই যুগের সম্পূর্ণোপযোগী। পাপাণু নাশ করিতে হরি নামের মত যেমন মহাশক্তি সম্পন্ন মহাস্ত্র আর নাই,রোগাণুর বিনাশেও হোমিওপ্যাথির মত অপূর্ব্ব বিধান আর নাই। এই উভয়ের মূলে বিধাতার যে অপূর্ব্ব মহীয়সী শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে তাহা ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির অগম্য। হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ-বিধান-তত্ত্ব যখন সাতসমুদ্র তের নদীপার হইয়া ভারতে আসিয়া এই অল্প দিনের মধ্যে এই ঘোর পরিপন্থী এলোপ্যাথি ও কবিরাজী প্রভৃতি প্রাচীন বিধানরাজির সমক্ষেও জয়ী হইয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে,তখন ইহা যে এক কালে জগতের প্রধানতম চিকিৎসা-বিধানরূপে পরিগণিত হইবে না,তাহা কে বলিতে পারে? সত্যের জয় হউক ইহাই আমার প্রাণগত ভিক্ষা ও প্রার্থনা।

আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকু ইহার প্রচার করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। ভগবানের রোগগ্রস্ত দুঃস্থ সন্তানগণের সেবার জন্য দাস রূপে আমার প্রাণ ও মন সমস্তই নিয়োজিত করিলাম। ফলাফল একমাত্র ফলদাতা বিধাতাই জানেন। প্রভু যেমন ভৃত্যদ্বারা কার্য্য সম্পাদিত করিয়া লন, বিধাতাও তাঁহার কার্য্য এই নগণ্য দাসের দ্বারা নির্ব্বাহিত করিবেন। তাঁহার কার্য্য তিনিই চালাইবেন আমি ইহার জন্য কাহারও নিকট প্রার্থী হইব না। যাঁহারা আমার নিকট চিকিৎসিত হইবার আশায় আসিবেন আমি কখনই তাঁহাদিগকে বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিব না। পীড়া বা কোন আকস্মিক অনিবার্য্য কার্য্য বশতঃ নিতান্ত অসমর্থ বা উত্থানশক্তি রহিত না হইলে এই সেবা ব্রতের বাধা করিব না।"

তিনি দিনাজপুর আসিয়া প্রথমতঃ তাঁহার দুই একটি দরিদ্র ছাত্রকে চিকিৎসা করিলেন তাহাতে বেশ ফল হইল দেখিয়া ক্রমে লোকে তাঁহার চিকিৎসার অনুরাগী হইল। না হইবে কেন? বিনা ব্যয়ে সুচিকিৎসা পাইলে, লোকে অর্থব্যয় করিবে কেন? তারপর হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইতে কোন কষ্ট নাই, উহা বিস্বাদ নহে, সুতরাং রোগিগণ পণ্ডিত মহাশয়ের ঔষধের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। জিলাস্কুলে থাকা কালে তাঁহার রোগী সংখ্যা খুব কমই ছিল। অধিকাংশ ছাত্রের অবস্থাই মধ্যম। তারপর তিনি নূতন, এবং হোমিও-প্যাথি চিকিৎসাও তখন সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। অভিভাবক গণের অনেকেরই হোমিওপ্যাথির উপর তেমন আস্থা ছিল না। দৈনিক দুই চারিটি মাত্র রোগী তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহাদিগকে ঔষধ দিতেন,—তখন তাঁহার চিকিৎসালয় বা কম্পাউণ্ডার কেহ ছিল না।

ঔষধ বাক্সে থাকিত, তিনি নিজেই ব্যবস্থা করিতেন এবং নিজ হস্তেই ঔষধ দিতেন। মডেল স্কুলে যাওয়ার পর তাহার রোগীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইহার মধ্যে তাঁহার ছাত্রই অধিক ছিল। এই সব ছাত্র দরিদ্র,—ডাক্তারের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দেওয়া তাহাদের পিতা মাতার পক্ষে অসাধ্য ছিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া গড়ে দৈনিক প্রায় ১৫ জন দাঁড়াইল। ক্রমে রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। দশবৎসরের মধ্যে রোগীর সংখ্যা গড়ে দৈনিক প্রায় পাঁচিশ জন হইয়া উঠিল। তখন বাসায় সুনীতিবালা পণ্ডিত মহাশয়ের অনেকটা সাহায্য করিত। তিনি তখন প্রায়ই ঔষধের বাক্স লইয়া রোগীর বাটীতে যাইতেন,—রোগী দেখিয়া ঔষধ দিয়া আসিতেন। অতি অল্পসংখ্যক রোগীই বাসায় ঔষধ নিতে আসিত। এই সময়েই দিনাজপুরের জেলা জজ মিঃ কেলী তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেন। তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের দাতব্য ও সুচিকিৎসার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের চিকিৎসায় তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি যতদিন দিনাজপুরে ছিলেন, অসুস্থ হইলে সিবিল সার্জ্জনের চিকিৎসাধীনে না থাকিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন। একদিন রাত্রে তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায়, প্রাতে পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিত মহাশয় গিয়া তাঁহার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। সাহেব পণ্ডিত মহাশয়কে প্রাতরাশের জন্য চা, রুটি ও ডিম আনাইয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন,—"আমাকে ক্ষমা করিবেন আমি নিরামিষভোজী, এই আমিষাত্মক খাদ্য আমার প্রবৃত্তির

বিরোধী।" এই কথা শুনিয়া সাহেব ঐ সকল খাদ্য তাঁহার সম্মুখ হইতে বাবুর্চিকে লইয়া যাইতে বলিলেন; এবং তাঁহার বাগান হইতে ফল-মূল-শাক-সব্জী তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি যতদিন দিনাজপুরে ছিলেন মাঝে মাঝে ভুবন মোহনকে এইরূপ প্রীতির উপহার প্রদান করিতেন।

রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, তিনি তাঁহার পাঠাগারে একটি আলমারীতে বেশী পরিমাণ ঔষধ আনিয়া রাখিতে লাগিলেন। তখন বালুবাড়ীর ছাত্রগণ মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার ঔষধ বিতরণের সাহায্য করিতে লাগিল। তখনও তিনি রোগীর রেজেষ্টারী খুলেন নাই, কেবল কাগজে নাম ধাম টুকিয়া রাখিতেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোগীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া উঠিল, তাই তিনি সেবাব্রত পালনের জন্য চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন বেতন-ভোগী কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিলেন এবং ১৯০০ সালে রোগীর সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হওয়ায় আর একজন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিলেন। তখন অনেক মাদার টিঞ্চার আনাইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লইতেন। প্রথমে ম্যাঙ্গালোর হইতে ঔষধ আনাইতেন। সেখানে মূল্য সুলভ ছিল, কিন্তু তাহারা ধারে ঔষধ দিত না। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেক সময় ধারে ঔষধ দিতেন। এনিমিত্ত অতঃপর তিনি তাঁহার দোকান হইতেই ঔষধ আনাইতে আরম্ভ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যবসায়ী হইলেও সদাশয় ও দানশীল। তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের এই মহৎ কার্য্যের সাহায্যে

বার্ষিক একশত টাকার ঔষধ দান করিতেন। এস্থলে আমরা আর একজন সদাশয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি বরিশালের সেই স্বনামধন্য যাত্রা-দলপতি মহাপুরুষ মুকুন্দদাস। গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দিনাজপুরে গান করিতে আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সেবাব্রতের সাহায্যার্থে পঁচিশ টাকা দান করেন। চাকুরী পরিত্যাগের পর পেন্‌সনের কুড়ি টাকাই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। তাহা দ্বারা নিজের খোরাকী, দরিদ্রকে দান ও ঔষধ বিতরণ এবং ঔষধালয়ের ব্যায় নির্ব্বাহ একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। বদান্য-বর ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত রায়সাহেব বাহাদুর তাঁহার আহারের জন্য ৺রাধাগোবিন্দ জীর ভোগের ব্যবস্থা করিলেও অর্থকৃচ্ছ্রতা দূরীভূত হইল না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ শূন্য হইল; তিনি তাহার প্রার্থী হইলেন। তিনি মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বালিকাগণকে নীতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তিনি সুনীতি বালা প্রভৃতির ব্রাহ্ম-বিবাহ ও কতিপয় বিধবার বিবাহ দেওয়ায় হিন্দু-সমাজ মনে করিল, তিনি বালিকাগণকে হিন্দুধর্ম্ম-বিগর্হিত শিক্ষা দিতেছেন। এজন্য স্কুলের হিন্দু সভ্যগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল; অগত্যা তিনি সে পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

ভুবন মোহন ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, নিষ্কাম ভাবে পরসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কার্য্য বন্ধ থাকিতে পারে না। যাঁহার কার্য্য, তিনিই চালাইতে লাগিলেন। ভুবন মোহন কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থী না হইলেও, অনেকে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া, তাঁহার এই মহাব্রতের

সাহায্য করিতেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে দশটা পর্য্যন্ত সমাগত রোগী দিগকে ঔষধ বিতরণ করিয়া, যে সকল রোগী তাঁহার চিকিৎসালয়ে আসিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে দেখিতে বাহির হইতেন। বেলা দুইটা পর্য্যন্ত রোগীর বাড়ী ঘুরিয়া বাসায় ফিরিতেন এবং স্নানাহারান্তে আবার বেলা চারটার সময় বাহির হইয়া অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিতেন। তিনি কেবল ঔষধ বিতরণই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিতেন না, অবস্থা গতিকে অনেক রোগীর শুশ্রূষার ভারও গ্রহণ করিতেন। ক্রমে সুদূর মফঃস্বলেও তাঁহার গুণ-গরিমা প্রচারিত হইল। মফস্বলের অনেক দরিদ্র কৃষক আসিয়া তাঁহাকে অনেক সময় লইয়া যাইত। তাহারা পথ্যাদি পাক করিতে না জানিলে তিনি নিজে পথ্য পাক করিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে একদিন বর্ষাকালে সন্ধ্যার একটুকু পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে সহরের বাহির, করিমুল্লাপুরের রাস্তায় যাইতে দেখিয়া 'কোথায় যাইতে-ছেন' জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, "করিমুল্লাপুরের একজন রোগীর ঔষধ আনিতে একজন লোক গিয়াছিল, আমি রোগীকে মাগুর মাছের যুষ খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়ায়, সে বলিয়াছে যুষ পাক করিতে তাহারা জানে না, তাই আমি তাহাকে যুষ পাক শিখাইতে যাইতেছি।" করিমুল্লাপুর, তাঁহার বাসা হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী। বর্ষার সময় রাস্তাও কর্দ্দমাকীর্ণ। সেই দুর্গম পথে বর্ষার প্রদোষে পরহিতার্থে তাঁহাকে পদব্রজে এতদূর পথ যাইতে দেখিয়া, পাষাণহৃদয়ও ক্ষণেকের জন্য ভক্তিবসে দ্রবীভূত হইল। তাঁহার রোগী সংখ্যা ক্রমশঃ আরও বর্দ্ধিত হওয়ায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোগিগণের রীতিমত রেজেষ্টরী খুলিলেন। এ বৎসর রোগীর সংখ্যা প্রায় ৬০০০ হইল। ক্রমেই রোগীর সংখ্যা

যতই বাড়িতে লাগিল ঔষধ ও আলমারীর সংখ্যাও তাঁহাকে ততই বাড়াইতে হইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেখিলেন, তাঁহার চিকিৎসালয়ের আয়তন বৃদ্ধি না করিলে রোগিগণকে ঔষধ বিতরণ ও তাহাদের অবস্থানের স্থান সংকুলন হইতেছে না। এই কার্য্যে প্রায় দুই হাজার টাকার প্রয়োজন, এই টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? তাঁহার হাতে টাকা নাই। লোকের নিকট ও তিনি চাহিতে যাইবেন না, তবে এ টাকা সংগ্রহের উপায় কি? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন, যিনি তাঁহাকে এ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন তিনিই এ টাকা দিবেন। তখন তিনি সেই ভগবানের পাদপদ্মে নির্ভর করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বদান্যবর রায় সাহেব বাহাদুরের সুযোগ্য কনিষ্ট কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায় ও মাজদিহার জমিদার ৺রাধা গোবিন্দ চৌধুরী মহোদয় দ্বয় যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। ইটের দেওয়ালের উপর টীনের ছাদ দিয়া, চিকিৎসালয়ের আয়তন বর্দ্ধিত হইল। এই ঘরের কার্য্য শেষ হইতে প্রায় ৮০০৲ তাঁহার ঋণ হইল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া দিনাজপুরের জনসাধারণ চান্দা তুলিয়া তাঁহাকে ঋণ মুক্ত করিলেন। ইহাই বর্ত্তমান ভুবন মোহন-দরিদ্র-দাতব্য-হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসালয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই চিকিৎসালয়ে প্রায় ২০০০০ রোগী হইয়াছিল।

তিনি শিক্ষায় যেমন ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, শিক্ষা-দানে যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, আবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ও সেইরূপ পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইত। ব্রহ্ম-যুদ্ধের পর তিনি বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ব্রহ্মদেশে গিয়া-

ছিলেন। প্রথমে রেঙ্গুনে অবতরণ করেন, পরে ইরাবতী নদী দিয়া পেগু, আভা ও অমরাবতী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিবার কালে পথিমধ্যে একজন ইউরোপীয় উচ্চ রাজপুরুষের সহধর্ম্মিণীকে সর্দ্দি-গর্ম্মি রোগাক্রান্ত দেখিতে পান। সাহেব, পত্নীর চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া ফল পাইতে ছিলেন না। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্সটি সঙ্গেই রাখিতেন। তখনও তাহা তাঁহার সঙ্গেই ছিল। সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসক জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই দুই এক ফোঁটা ঔষধ দিয়া রোগিণীকে সুস্থ করিলেন। তদ্দর্শনে সাহেব যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পারিতোষিক দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর সাহেব তাঁহাকে ইউরোপীয়গণের উপাদেয় নানারূপ খাদ্য আনিয়া দিয়া খাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহা দেখিয়া তিনি কহিলেন, "মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি নিরামিষ ভোজী,—এই আমিষাত্মক খাদ্য আমার রুচির বিরোধী, এজন্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না।" এই কথা শুনিয়া অগত্যা সাহেব কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু ফল-মূল তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পর তিনি একজন ব্রাহ্ম মহিলাকে আনিবার জন্য রেঙ্গুন যাইতেছিলেন। তাঁহাদের জাহাজখানি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিলে একজন আরোহিনী ইংরেজ মহিলা সমুদ্র-বমন রোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই জাহাজে তাঁহার স্বামীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জাহাজের ডাক্তারকে তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত

করিলেন, কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন ফল দর্শিল না,—ইংরেজ মহিলা ক্রমেই অধিকতর কাতরা হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার স্বামী বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অকূল অর্ণববক্ষে সুচিকিৎসার আর কোন সুবন্দোবস্ত করিবার উপায় নাই দেখিয়া তিনি একেবারে হতাশ হইলেন। সাহেবের এই বিপদের কথা শুনিয়া দয়ার সাগর ভুবন মোহন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সাহেবের নিকট গিয়া কহিলেন, "আপনার পত্নী নাকি 'সমুদ্র-বমনে' অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আমার নিকট উহার বেশ ভাল ঔষধ আছে,যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে আমি দেখিতে পারি।" অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে পথভ্রষ্ট পথিকের সাহায্যে সহসা কেহ আলো আনিলে যেরূপ তাহার হৃদয় আশ্বস্ত হয়, সাহেবও তদ্রূপ আশ্বস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অতীব আগ্রহ সহকারে নিজ কক্ষে লইয়া গেলেন। ভুবন মোহনের সুনির্ব্বাচিত দুই এক দাগ ঔষধেই ইংরেজ মহিলা সুস্থ হইলেন। তখন সাহেব তাঁহার জন্য ইউরোপীয় উপাদেয় নানাবিধ খাদ্য আনাইয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন, কিন্তু ভুবন মোহন তাহা খাইলেন না, কহিলেন, "আমি নিরামিষভোজী, আপনার এই শ্রদ্ধার জিনিষ আমি গ্রহণ করিতে না পারিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম, আশাকরি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।" সাহেব "আচ্ছা বেশ" বলিয়া তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। ভুবন মোহন তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন, সাহেব কাপ্তেনের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন লইলেন এবং তাঁহার জিনিষ পত্র লোক দ্বারা তৎক্ষণাৎ তথায় আনাইয়া তাঁহাকে তথায় থাকিবার যথা

যোগ্য সুব্যবস্থা করিলেন। যথাকালে জাহাজ রেঙ্গুন পৌছিলে, সাহেব কুলি দ্বারা তাঁহার জিনিস পত্র তাঁহার গন্তব্য স্থলে পৌছাইয়া দিলেন।

তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমান্ ভারতেশ্বরের রাজ্যাভিষেকোপলক্ষে অনর-সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অনেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখিতে আসিত। তিনি তাহাদিগকে যথাবিধ শিক্ষা দিয়া তিন বৎসরান্তে পরীক্ষা লইতেন, এবং উপযুক্ত ছাত্রকে ডিপ্লোমা দিতেন। তাঁহার এই চিকিৎসালয় সংস্থষ্ট শিক্ষা-সমিতির নাম "Dinajpur Homeopathic Poor Charitable Dispensary and Hannimana club"

আমরা গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত তাঁহার অনর-সার্টিফিকেটের নকল পাঠক গণের কৌতূহল নিবারণার্থ নিম্নে প্রকাশ করিলাম,—

"By Command of His Excellency the Viceroy and Governor General of India in council this cirtificate is presented in the name of His Most Gracious Majesty King George v Emperor of India on the occasion of His Imperial Majesty's Coronation Durbar at Delhi to Bábu Bhuban Mahan Kar, late Pandit of the Middle English school, Dinajpur in recognition of services in the gratuitous treatment of the sick people as a Homeopathic Doctor."

12th December 1911	(Sd) S. Balay Lieutenant governor of Eastern Bengal and Assam

সাধারণেরও তাঁহার চিকিৎসায় অটল বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা কেহ তাঁহাকে মহর্ষি কেহ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিত, এবং তাঁহার ঔষধ দৈব ঔষধ জ্ঞানে যারপরনাই শ্রদ্ধা করিত। একদিন একজন বৃদ্ধ মুসলমান রোগী তাঁহার নিকট আসিল। তিনি তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবককে ঔষধ দিতে বলিলেন, স্বেচ্ছাসেবক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধের তাহাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না,—সে কহিল,"পণ্ডিত মহাশয়! তুমি কাঁহা দাওয়া দিলেন? তুমি নিজে দাওয়া না দিলে মোর বেরাম সারিবার নহে।" ভুবন মোহন তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে বিস্মিত হইলেন এবং পূর্ব্ব প্রদত্ত ঔষধ ফেলিয়া দিয়া নিজ হাতে তাহাকে ঔষধ দিলেন। কয়েক দিন পরে সে আবার ঔষধ নিতে আসিয়া কহিল, "মোর তিন ভাগ ব্যারাম সারি গিছে। তোমার দাওয়া হ'ল খোদার দাওয়া। আজ ঔষধ নিলেই বাকীটুকু সারি যাবে।"

তিনি সেবাব্রতে যেরূপ অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করিতেন তাহা বর্ণনাতীত। একদিন শ্রাবণ মাসে সন্ধ্যা হইতে অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি তাহাতে আবার নিবিড় ঘনঘটায় গগন সমাচ্ছন্ন, সুতরাং গাঢ় অন্ধকার। সেই সময় একজন ভদ্রলোক সহরতলীর একটি রাস্তা ধরিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ বিদ্যুতালোকে দেখিলেন অদূরে বৃক্ষমূলে একটি লোক ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়া আছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" বৃক্ষতলাস্থ, উত্তর করিলেন, "আমি ভুবন মোহন।" ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি এসময় এমন ভাবে এখানে?" ভুবন মোহন কহিলেন, "বাবা! এখানে একটি গরীব রোগী আছে, একটিমাত্র চালির মধ্যে থাকে, ও পাক শাক

ক'রে খায়, উহাতে বসিবার স্থান নাই। রোগীটি বিকারগ্রস্ত। এই মাত্র তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়াছি, সে একটুকু চৈতন্য লাভ করিলেই বাসায় ফিরিয়া যাইব।" ভদ্রলোকটি ভুবন মোহনের কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। অতঃপর তিনি চলিয়া গেলেন। ভুবন মোহন সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত রোগীর চিকিৎসাও শুশ্রূষা করতঃ তাহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া বাসায় ফিরিলেন।

তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, আত্মীয় ও শত্রুতে যে একই অদ্বয় পরমাত্মা বিরাজমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা তিনি তাঁহার সেবা-ব্রতে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি ঘটনা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম।

(১)

মডেল স্কুলে থাকা কালে জগদ্বন্ধু পাট্টাদার নামক এক জন ছাত্র অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া রোগী-সেবার সাহায্য করিত। এক দিন তিনি জগদ্বন্ধুকে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দিনাজপুরের পার্শ্ববর্ত্তিনী পুনর্ভবা তটে উপস্থিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার জননী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই খানেই তাঁহার পাঞ্চ ভৌতিক দেহের অবসান হইয়াছে। মাতৃভক্ত ভুবন মোহন মাতার সেই পবিত্র শ্মশানে গিয়া বসিলেন, এমন সময় অদূরে একটি মানুষের ক্ষীণ কাতর স্বর তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। তখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকার শ্মশানের নিস্তব্ধতার সহিত মিলিয়া স্থানটিকে একটুকু ভয়ানক করিয়া তুলিতেছিল। তিনি কাতরস্বর কোথা হইতে আসিল, অনুসন্ধান করার জন্য ছাত্রটিকে

বলিলেন। সেদিন শনি বা মঙ্গল বার ছিল কিনা তাহা জানিনা, যে বারই হউক না কেন সেই সন্ধ্যার সময় নির্জ্জন শ্মশানে কাতর স্বর শুনিয়াইত ছাত্রের প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে,—তখন আর সেই স্বর কোথা হইতে আসিল তাহা তাহার খুঁজিবার সাহস হইল না। অগত্যা পণ্ডিত মহাশয় নিজেই উঠিয়া, যেদিক হইতে স্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন, সেই দিকে চলিলেন। ছাত্রও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার পাছ পাছ চলিল। একটুকু অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন একটি সদ্য-নির্ব্বাপিত চিতার পার্শ্বে একটি বিছানা পড়িয়া আছে সেই খান হইতেই ঐ কাতর স্বর উঠিতেছে। ভয়ে ছাত্রের বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইল, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারিলনা। পণ্ডিত মহাশয় উহার নিকটে গিয়া দেখিলেন, ঐ বিছানার পার্শ্বে একটি মেথর মাটিতে পড়িয়া কেকাঁইতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে মল লাগিয়াছে, বাহ্যজ্ঞান নাই, শরীর হিম হইয়া গিয়াছে। ভুবন মোহন ছাত্রটিকে লোকালয় লইতে কিছু খড়ি আনিতে বলিলেন। ছাত্র এবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে উর্দ্ধশ্বাসে লোকালয় পানে ছুটিল, এবং অনতি বিলম্বে কিছু খড়ি ও কয়েকজন লোক লইয়া প্রত্যাগত হইল। ভুবন মোহন সেই খড়িতে আগুন জ্বালিয়া রোগীর গায়ে তাপ দিতে লাগিলেন এবং সেই আলোকে, সঙ্গীয় বাক্স হইতে ঔষধ বাহির করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। অতঃপর আর কয়েকটি ঔষধের জন্য ছাত্রকে বাসায় পাঠাইয়া নিজে রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। যথাকালে ছাত্র ঔষধ ও রোগীর কতিপয় আত্মীয়-স্বজন সহ প্রত্যাগত হইল। ভুবন মোহনের সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষায় রাত্রি বারটার সময় রোগীর চৈতন্য হইল। তিনি

সারারাত্রি সেই শ্মশানে বসিয়া রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিলেন; রোগী আরোগ্য লাভ করিল। হতভাগ্য একটি কলেরায় মৃতের বিছানা-পত্র শ্মশান হইতে আনিতে গিয়াই নাকি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ঐ প্রকার মরণাপন্ন হইয়াছিল।

(২)

একদিন একজন মেথরাণী ঔষধ লইবার জন্য, ঔষধ-কক্ষে প্রবেশ করায় একজন স্বেচ্ছাসেবক তাহার উপর ঘৃণাত্মক কটূক্তি প্রয়োগ করিল, তাহাতে ভুবন মোহনের দয়ার হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি সেবককে কহিলেন, "বাবা এটি আমার দীনের ক্ষেত্র। তোমরা কাহাকেও ঘৃণা করিলে আমার সেবা-ব্রতের অঙ্গহানি হইবে। ইহারা আমাদের মাতৃস্থানীয়া। মা কেবল শৈশবেই মল-মূত্র ফেলেন, ইহারা এক্ষণে আমাদের মায়ের ন্যায় মল-মূত্র ফেলিয়া থাকে। ইহাদিগকে ঘৃণা করিও না।"

(৩)

একদিন বেলা দশটার পর পণ্ডিত মহাশয় রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেলে একজন বারবনিতা শশব্যস্তে তাঁহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিল। হতভাগিনীর এক মাত্র পুত্র কলেরায় ঘোরতর কাতর, তাই সে ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়কে বাহিরে না পাইয়া সে মনে করিয়াছিল হয়ত বা তিনি ভিতরে আছেন, তখন হতভাগিনীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাই সে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ, বেশ্যাকে বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্টা দেখিয়া ক্রোধান্ধা হইলেন, এবং তাহাকে রূঢ়

বাক্যে বাহির করিয়া দিলেন। হতভাগিনী পুত্রের কাতরতা উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে ভগ্নমনে বাড়ী চলিয়া গেল। অপরাহ্নে ভুবন মোহন রোগী দেখিয়া বাসায় ফিরিলেন। স্নানান্তে তিনি খাইতে বসিয়াছেন, মাত্র দুই এক গ্রাস মুখে দিয়াছেন, এমন সময় সেই সংবাদ বাড়ীর বালক-বালিকাগণের নিকট জানিতে পারিয়া, তিনি একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন, আর খাওয়া হইল না, তৎক্ষণাৎ মুখ ধুইয়া ঔষধের বাক্স সহ বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই হত-ভাগিনী বারবনিতার দ্বারে গিয়া বলিলেন, "মা! আমি তোমার ছেলেটিকে দেখিতে আসিয়াছি।" বারাঙ্গনা হতাশ হৃদয়ে মুমূর্ষু পুত্রের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল, এবং পুত্রের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলাশঙ্কায় তাহার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে ভুবন মোহনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল। সে তাড়াতাড়ি দরজায় গিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভুবন মোহন তাহাকে আশ্বাস দিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার পুত্রের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুচিকিৎসায় বালক অনতিবিলম্বে আরোগ্য লাভ করিল।

(৪)

একদিন স্বর্গীয় মহারাজা সার গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই, ভুবন মোহনকে নেওয়ার জন্য প্রাতে গাড়ী ও চিঠি পাঠাইয়া-ছেন। তাঁহার একমাত্র শিশু পৌত্রটি ধনুষ্টঙ্কার পীড়ায় কাতর। তখন প্রায় শতাধিক রোগী ভুবন মোহনের চিকিৎসালয়ে ঔষধ লইতে আসিয়াছে। পাঠক! এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে নিশ্চয়ই রাজ-

প্রসাদ লাভের এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না। কিন্তু সমদর্শী দরিদ্রবৎসল ভুবন মোহন কি করিলেন? তিনি মহারাজার পত্রের উত্তরে জানাইলেন, "এখানে বহুদূর হইতে দীন, দুঃখী, অনাথ, আতুর শতাধিক রোগী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের ঔষধাদির ব্যবস্থা না করিয়া, এবেলা আমি কিছুতেই যাইতে পারিব না। প্রয়োজন হইলে বৈকাল বেলা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটুকু সংবাদ দিলেই যাইব। ভরসা করি এই গর্হিত ত্রুটি অবশ্যই ভবাদৃশ দীন-জন-পালক মহারাজা বাহাদুর-সমীপে ক্ষমা ও পরিহার যোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।"

(৫)

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জগদীশ বাবুর পুত্র একদিন জ্বরে কাতর হইয়া পড়ে। পণ্ডিত মহাশয় তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। ঐদিন রংপুর টাউনের একজন ভদ্র লোক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, তাঁহার একটি আত্মীয় বালক অনেক দিন হইতে প্রাণ-সংশয়-কাতর, এ পর্য্যন্ত অনেক চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই ফল হয় নাই, তাই তিনি তাঁহার নিকট আসিয়াছেন! এই কথা শুনিয়া আর্ত্তবন্ধু ভুবন মোহন ঐ দিন অপরাহ্নে রংপুর যাইতে সম্মত হইলেন। অপরাহ্নে জগদীশ বাবুর পুত্রটির জ্বর বৃদ্ধি পাইল, মাঝে মাঝে ফিট হইতে লাগিল। তখন পণ্ডিত মহাশয় ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন, জগদীশ বাবু তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া তাহাকে রংপুর যাওয়া স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রের জন্য যে ব্যবস্থা আবশ্যক তাহা করিয়াছি, শুধু তোমার পুত্র লইয়া আমি বসিয়া থাকিতে পারি না। যাহাকে দেখিতে যাইতেছি সেও একজনের পুত্র।"

জগদীশ বাবু আর কথা কহিলেন না। সেখানে কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা একথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। অতঃপর ভদ্রলোকটি তাঁহার জন্য একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন আসিল। ভদ্রলোকটি তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠাইতে গেলেন, তিনি তাহাতে উঠিলেন না, বলিলেন, "আমি নিজেও দরিদ্র, দরিদ্র লইয়াই আমার কাজ। আমাকে অনেক দরিদ্র রোগীর চিকিৎসার জন্য রেলে যাইতে হয়। আজ আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গেলে হয়ত অনেকে মনে করিবে আমাকে রেলে নিতে হইলে তাহাদের অনেক খরচ পড়িবে, এজন্য হয়ত অনেক দরিদ্র রোগী আমার নিকট আসিবে না। তাহা হইলে আমার সেবা-ব্রতে বিঘ্ন ঘটিবে।" এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি অগত্যা তাঁহার জন্য একখানা রিটার্ণ টিকেট করিয়া তাঁহাকে মধ্য শ্রেণীতে উঠাইয়া লইলেন। ভদ্রলোকটি তাঁহার এই কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাকে ঋষিতুল্য মনে করিয়া ভক্তি করিতে লাগিলেন।

(৬)

একদিন শীত কালে তাঁহার জ্বর হইয়াছে। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় ঘাসীপাড়ার কেদার বাবু আসিয়া ব্যস্তভাবে জগদীশ বাবুকে বাহির হইতে ডাকিতে লাগিলেন। জগদীশ বাবু বাহিরে আসিলে, তিনি কহিলেন তাঁহার পিতা অত্যন্ত কাতর, তাই তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিতে আসিয়াছেন। জগদীশ বাবু বলিলেন, "তিনিও জ্বরে কাতর।" তাহা শুনিয়া কেদার বাবু একেবারে হতাশ্বাস হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভুবন মোহন কেদার বাবুর কথা

গুলি শুনিতে পাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিলেন এবং কেদার বাবুকে আশ্বাস দিয়া সেই রুগ্ন দেহে দিনাজপুরের দারুণ শীতের গভীর রজনীতে তাহার সঙ্গে চলিলেন। জগদীশ বাবু একটুকু আপত্তি করিলেন,—তিনি কেদার বাবুকে ডাক্তার ডাকিয়া নিতে বলিলেন। ভুবন মোহন তাঁহার আপত্তি শুনিলেন না। জগদীশ বাবুর কথায় কেদার বাবু একটুকু ইতস্ততঃ করিলে, তিনি জগদীশ বাবুর প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যখন আমি সংবাদ পাইয়াছি তখন আমি অবশ্যই যাইব। কেদার বাবু আমাকে নিতেছেন না, আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বকই যাইতেছি।" জগদীশ বাবু আর কথা কহিলেন না। ভুবন মোহন কেদার বাবুর সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া রওনা হইলেন।

তাঁহার সেবাব্রতের এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়াও সেবাব্রতে বিরত হন নাই। তিনি পীড়িত হইলে জগদীশ বাবু বাহিরের দরজা বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া দিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারেন নাই,—তিনি পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া চিকিৎসালয়ে আসিতেন। তাঁহাকে অসুস্থ দেহে সেবার কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে তিনি বলিতেন, "বাবা! পরের সেবাই আমার জীবনের ব্রত; যতদিন আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিবে ততদিন আমি কিছুতেই এই ব্রত ভঙ্গ করিতে পারিব না। আমি যে ব্রত লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছি, তাহা যদি না করি, তাহা হইলে ভগবানের কাছে কি জবাব দিব? বাবা! এই রোগী-সেবা করিয়াই আমি আনন্দ পাই এবং ইহাতেই রোগ-যন্ত্রণার উপশম বোধ করি।"

তিনি পূর্ব্বে রোগীর বাটীতে পদব্রজেই যাইতেন, প্রত্যহ প্রায় দশ মাইল ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বার্দ্ধক্যে ও রোগে ইদানীং শরীর অশক্ত হওয়ায় মালদুয়ারের স্বনাম-ধন্য সদাশয় জমিদার শ্রীযুক্ত টঙ্ক নাথ চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি তাঁহাকে একখানি গাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

তাঁহার এই অতুলনীয় নিষ্কাম সেবা-ব্রত, ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার জন্য দিনাজপুরবাসী রাজা জমিদার হইতে পথের ভিখারী এবং উচ্চ রাজ-পুরুষ হইতে মিউনিসিপালিটীর চাপরাসী পর্য্যন্ত তাঁহাকে মহর্ষিজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তির মন্দাকিনী সমগ্র দিনাজপুর প্লাবিত করিয়া বঙ্গের সমস্ত জেলা এমন কি ভারতের দূরবর্ত্তী স্থানেও প্রবাহিত হইয়া বঙ্গেশ্বরগণেরও ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে দিনাজপুর-মহারাজা গিরিজা নাথ-নিউ হাই স্কুলের ভিত্তিস্থাপন-উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর মহামান্য লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। তিনিই উহার ভিত্তিস্থাপন করেন। প্রাতে সভার অধিবেশন হইল। যখন বঙ্গেশ্বর সভায় প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন তখন একজন শ্বেত-শ্মশ্রু-শোভিত বৃদ্ধ সভামণ্ডপে ধীর-গম্ভীরে প্রবেশ করিলেন। বঙ্গেশ্বর দেখিলেন বৃদ্ধের বদনমণ্ডলে পুণ্যপ্রতিভার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকাশিত হইতেছে, তাঁহার পরিধানে একখানা মোটা থানের ধুতি, সেই শীতের প্রাতঃকালেও গায়ে সামান্য একটি সাদা জামা তদুপরি সাদা কাপড়ের দেড় পাট্টা, পায়ে সামান্য একজোড়া চটি। বৃদ্ধ মণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র দিনাজপুরাধিপতি সসম্ভ্রমে

গাত্রোত্থান করতঃ তাহাকে করযোড়ে নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তদ্দর্শনে বঙ্গেশ্বর জনান্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও জনান্তিকে সংক্ষেপে বৃদ্ধের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার পুণ্যকীর্ত্তি নিবেদন করিলেন। যথাসময়ে সভা ভঙ্গ হইলে মহামতি বঙ্গেশ্বর, সাগ্রহে বৃদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহার কর মর্দ্দন করতঃ সম্বর্দ্ধনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বয়স কত হইয়াছে?" বলা বাহুল্য এই বৃদ্ধই আমাদের ভক্তিভাজন ভুবন মোহন।

ভুবন। অষ্টাশি বৎসর।

বঙ্গেশ্বর। আপনার জীবন আমার জীবনাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনি আরও অষ্টাশি বৎসর জীবিত থাকিয়া, আপনার অবলম্বিত পরোপকার-ব্রত পালন করুন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ নবেম্বর ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর মহামান্য লর্ড রোণাণ্ডসে বাহাদুর তাঁহার পুণ্যময় চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া তাঁহার সহিত আলাপে পরম প্রীতি লাভ করতঃ তাঁহার মহাব্রতের সাহায্যার্থে এক শত টাকা দান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার পরলোক গমনের পর বৎসরও মহামান্য লাট বাহাদুর তাঁহার চিকিৎসালয়ের জন্য পাঁচ শত টাকা দান করিয়া চিকিৎসালয়টি তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ থাকিবে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মহামান্য বঙ্গেশ্বরের শ্রদ্ধা পূরিত পত্রখানির নকল পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম।

His Excellency Lord Ronald-shay visited the Charitable Dispensary of *indigenous* drugs of Pandit Bhuban Mohan

Vidyaratna at Dinajpur on the 25th November, 1919. His Excellency was much pleased with what he saw and gave a grant of Rs 100 to the Dispensary.

His Excellency was also pleased to give him a grant of Rs 500 in 1921 towards the cost of furniture for the Dispensary.

His Excellency is glad to think that this Dispensary will remain as a memorial of the Life and work of Bhuban Mohan Kar Vidyaratna.

(Sd). W. R. Gourlay
Private Secretary to H.E.
The Governor of Bengal
Dated 20 – 12 – 21.

এইরূপ সম্মান ক'জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? ভুবন মোহন এই অতুল সম্মান লাভ করিয়াও কিছুমাত্র গর্ব্বিত হন নাই। হইবেন কেন? তিনি যে আমাদের ন্যায় দম্ভাহঙ্কার-পূর্ণ জীব নহেন,—তিনি যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী মহাপুরুষ,—বিষ্ঠা-চন্দনে, শ্মশানে-সৌধে যে তাঁহার সম-জ্ঞান, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান সকলই যে তাঁহার সমান। তিনি যে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভগবানের বিভূতি দর্শন করিতেন। তিনি যে সংসারে থাকিয়াও রাজর্ষি জনকের ন্যায় নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার নব্বই বৎসর বয়সের পর দিনাজপুরের জন সাধারণ তাঁহার জন্ম-তিথি উপলক্ষে এক উৎসব করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া ছিলেন :

অক্লান্ত পরিশ্রমে সুদীর্ঘ কাল সেবা-ব্রত পালন করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্র পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অবস্থা বুঝিয়া জগদীশ বাবু তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা লইয়া গেলেন। সেখানে কিছুদিন চিকিৎসিত হইয়া একটুকু সুস্থ হইলেই তিনি দিনাজপুরে আসিতে ব্যস্ত হইলেন। ১৮ই আগষ্ট তিনি দিনাজপুরে প্রত্যাগত হইলেন, তখনও তাঁহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, চলিবার ফিরিবার সাধ্য ছিল না। সে অবস্থায়ও তিনি যথাসাধ্য রোগিগণকে ব্যবস্থা দিতেন। তাহাতে আবার তাঁহার পীড়া বাড়িতে লাগিল। স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। ভুবন মোহন চিকিৎসকগণকে বলিতেন, "বাবা! আর আপনারা আমার জন্য অনর্থক কষ্ট পাইতেছেন কেন? আমার সময় হইয়াছে,—আমার ডাক পড়িয়াছে।" চিকিৎসকগণ মুখে তাঁহাকে দুই একটী আশ্বাস-জনক বাক্য বলিয়াই অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বাহির হইয়া আসিতেন। ক্রমে তিনি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন, তখনও তাঁহার সেবা-ব্রতের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺যাদব চন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র কর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি তাঁহাকেই চিকিৎসালয়ের ভার দিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের ১৫ই ভাদ্র হইতে তিনি সাধারণের সহিত বাক্যালাপ একরূপ বন্ধ করিলেন, না ডাকিলে আর কথা কহিতেন না, সর্ব্বদা কেবল ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" উচ্চারণ করিতেন। দলে দলে সহরবাসী নরনারী গিয়া তাঁহাকে

দেখিতে লাগিল,—তাঁহারা তাহার শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। ১৮ই ভাদ্র রাত্রি প্রভাত হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সূর্য্যদেব যেন বিষাদে ম্লান মুখে উদিত হইলেন। আজ ভুবন মোহনের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। সে সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে তড়িদ্বেগে দিনাজপুরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। সমগ্র দিনাজপুর নৈরাশ্যের কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। ধনী, নির্ধন, বাঙ্গালী, মারোয়ারী সকলের মুখেই সেই এক নিরাশার ছায়া, সকলের মুখেই সেই এক কথা, "হায় আর বুঝি পণ্ডিত মহাশয় বাঁচিলেন না, আজ বুঝি আর্ত্তের বন্ধু, দরিদ্রের সহায় আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিলেন।" পথে, বাজারে ও অন্তঃপুরে সর্ব্বত্রই সেই নিরাশবাণী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিতে লাগিল।

ভুবন মোহন সেই স্তিমিত নেত্রে ধ্যান-মগ্নাবস্থায় শয়ন করিয়া অনবরত "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" বলিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন তাঁহার মুখে যাতনার চিহ্ন মাত্র নাই, বদন প্রসন্ন ; যেন তিনি সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ক্রমে তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইতে লাগিল, বেলা দুইটা সাত মিনিটের সময় "ব্রহ্ম কৃপাহি" মাত্র উচ্চারিত হইল, তাঁহার জিহ্বা একটু নড়িল, কিন্তু "কেবলম্" শব্দটী আর উচ্চারিত হইতে পারিল না। জিহ্বা স্থির হইল চক্ষু নিমিলিত হইল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দিনাজপুর বাসীকে কান্দাইয়া মহর্ষি মহাপ্রস্থান করিলেন।

ক্রন্দনের রোলে বালুবাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই নিদারুণ

শোক-সংবাদ দাবাগ্নির ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে সহরের চারিদিকে ছাইয়া পড়িল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থায়ই ছুটিয়া আসিল। আফিস-আদালত-স্কুল সমুদয় বন্ধ হইল। হাকিম, উকিল, মোক্তার, আমলা, মাষ্টার ও ছাত্রগণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে উর্দ্ধশ্বাসে মহর্ষির পবিত্র মূর্ত্তি জনমের মত দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। পুলিশ ফৌজ সহ পুলিশ সাহেব আসিয়া মহর্ষির পবিত্র দেহের সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অতঃপর তাঁহার পবিত্র দেহ চন্দন, পুষ্পও পুষ্প-মালায় শোভিত করিয়া শ্মশান-যাত্রার ব্যবস্থা করা হইল। বেলা চারিটার সময় সেই সমবেত জনমণ্ডলী শব লইয়া বাহির হইল। প্রায় চারিসহস্র নরনারী দর-বিগলিত নেত্রে শ্মশান-যাত্রায় যোগদান করিল। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের লোকই এই শ্মশানবন্ধুর মহাসম্মিলনে যোগ দিল। হিন্দু ও ব্রাহ্মগণ দলে দলে সংকীর্ত্তন করিয়া শবানুগমন করিতে লাগিলেন। সহরের সমুদয় বারাঙ্গনাগণও শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আলুলায়িত কেশে সেই শোকার্ত্ত জন-প্রবাহে যোগদান করিল। অশীতিপর বৃদ্ধগণও বলিয়াছেন এমন শ্মশান-যাত্রা তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই। সহর প্রদক্ষিণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে ব্রাহ্মমন্দির সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিধানানুযায়ী উপাসনা হইলে, সকলে শ্মশানাভিমুখে চলিলেন। মহর্ষির পবিত্র দেহ বহন করার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহাদের আগ্রহাতিশয্যে সকলকেই শবস্পর্শে অনুমতি প্রদত্ত হইল। ব্রাহ্মণ, মেথর, খ্রীষ্টান, মুসলমান ও বারাঙ্গনাগণ মহর্ষির পুণ্যময় দেহ বহন

করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। রাত্রি অনুমান আটটার সময় মহর্ষির পবিত্র দেহ পুনর্ব্বার শ্মশান-ক্ষেত্রে গিয়া পৌছিল। বারাঙ্গণাগণ ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণামৃত গ্রহণ করিল। পুষ্পমালা ও পুষ্পগুলি দেব-নির্ম্মাল্যের ন্যায় সকলেই আগ্রহ সহকারে ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে কুড়াইয়া লইল। সহস্র কণ্ঠের কীর্ত্তন-ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইল, নিদারুণ চিতা জ্বলিয়া উঠিল। দরিদ্রের বন্ধু, আর্ত্তের সহায়, মূর্ত্তিমান ব্রহ্ম-জ্ঞানের পবিত্র ছবি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইলেন।

মহর্ষি চলিয়া গেলেন, তাঁহার পাঞ্চ ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল ; রহিল তাঁহার অতুলনীয় বিশ্ব প্রেমের,—ভগবৎ প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের পুণ্যস্মৃতি! যতদিন জগতে ধর্ম্মের সম্মান থাকিবে, ততদিন দিনাজপুরবাসীর হৃদয়ে সে স্মৃতি জাগরিত থাকিবে।

পরিশিষ্ট।

শোকোচ্ছ্বাস।

(মহর্ষির দেহত্যাগের পর দিনাজপুর পত্রিকায় প্রকাশিত।)

হিমাদ্রির চূড়া পড়েছে খসিয়া
নাই এ জগতে ভুবন ঋষি ;
কাল-রাহু-গ্রাসে, হায় কবলিত
সেই অকলঙ্ক শারদ শশী।
বাল বৃদ্ধ যুবা রাজা কি ভিখারী
শোকের সাগরে ভাসিছে সবে ;
সবাই বলিছে করি হাহাকার
"দীনার্ত্তের গতি কি হবে এবে ?
কে আর মুছাবে অশ্রু সে সবার
মধুর বচনে তুষিবে হায় ?"
অই দেখ অই কত নর-নারী
আলু থালু বেশ পাগল প্রায়।
অহৈতুকী ভক্তি ছিল যাঁর হৃদে
সেবা-ব্রত-ধারী কুমার ধীর,
হিংসা-দ্বেষ-হীন, পৈশুন্য বর্জ্জিত
ষড়রিপু জয়ী অপূর্ব্ব বীর।

মহর্ষি ভুবন মোহন

সত্যমার্গচারী নির্লিপ্ত সংসারী
জগৎ যাঁহার আপন ছিল,
পঞ্চোনশতেক বৎসর বয়সে
হায়রে আজি সে চলিয়া গেল।

প্রতিভার জ্যোতিঃ পুণ্য-সুধা মাখা
হায় না হেরিব জীবনে আর!
কান্দিব, কান্দিবে এজগত বাসী
স্মরণ করিয়া মুরতি তাঁর।

কান্দিলে ফিরিয়া পাব কি তাঁহারে
আর কি মহর্ষি আসিবে ফিরে?
মর্ত্তে কর্ম্ম শেষ হয়েছে তাঁহার
তাই সে যাইছে অমর-পুরে।

যাও তবে দেব যাও নিজ ধামে
তুমি হে ত্রিদেব নগর বাসী।
"মনুষ্যত্ব কিবা" শিখালে মানবে
পাপ-পঙ্কময় মরতে আসি।

রোগ শোকে কত পেয়েছ যাতনা
আজ হতে তার হইল শেষ,
দেব, দেবাঙ্গনা, অভ্যর্থনা তরে
তোমার ধরেছে মোহন বেশ।

বাজিছে দুন্দুভি নন্দন কাননে
নাচিছে অপ্সরা কিন্নরীগণ,
"জয়—জয় জয় ভুবন মোহন"
গাইছে সকলে প্রফুল্ল মন।

পারিজাত-হার গাঁথিয়া যতনে
পরা'তে তোমারে আসিছে সবে,
এ-দৃশ্য অন্তরে করিলে অঙ্কন
বুঝিবা শোকের লাঘব হবে।

যতনে রাখিয়া হৃদয় মন্দিরে
পবিত্র চরণ-যুগল তব,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিব সযতনে
যতদিন ভবে বাঁচিয়া রব।

সমাপ্ত।



প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকারের নিকট

ও

দিনাজপুর

পুস্তকালয় সমূহে।